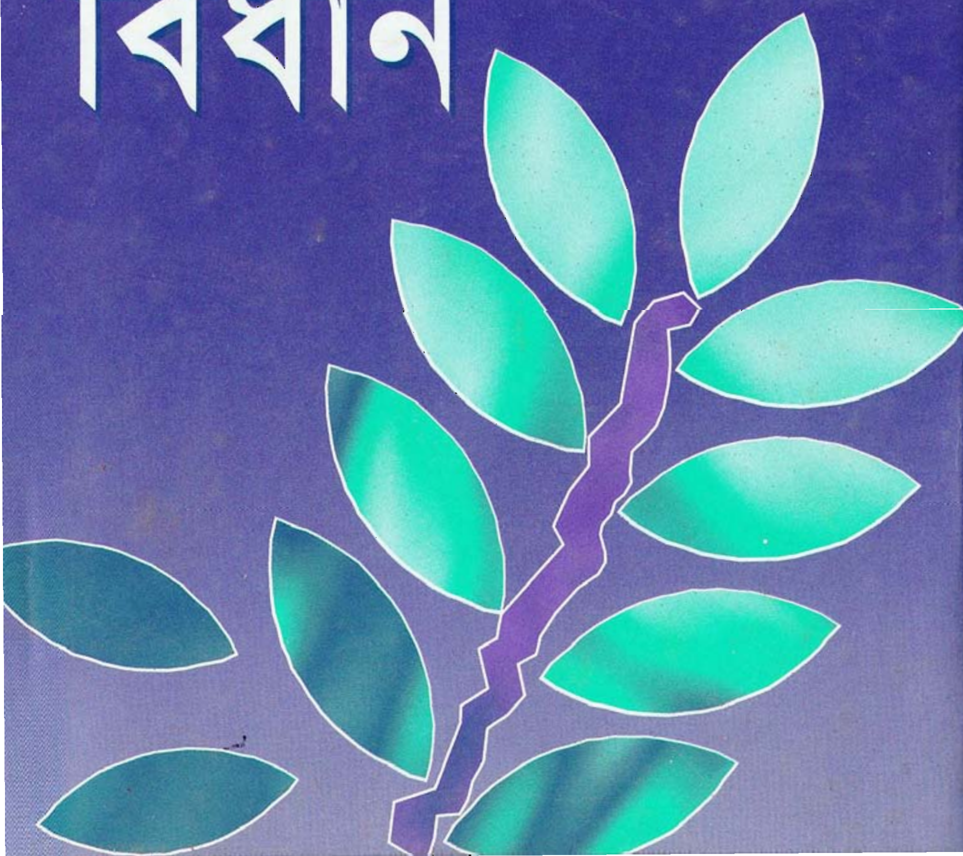
মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

বিজ্ঞান ও জীবন বিধান



বিজ্ঞান ও জীবন বিধান

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

রচনাকাল
জুলাই-আগস্ট১৯৭৫

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ১৯৮৮

দ্বিতীয় প্রকাশ
চৈত্র ১৪০৭, মহররম ঃ ১৪২১, মার্চ ২০০১

প্রকাশক
মোস্তাফা জহিরুল হক

খায়রুন প্রকাশনী
প্রধান কার্যালয় ঃ ১০/ই-এ/১ মধুবাগ, নয়াটোলা, মগবাজার
ঢাকা-১২১৭ ফোন ঃ ৯৩৪৭৫১৮-৯ EX ১১৮

প্রচ্ছদ শিল্পী
মোস্তাফা নাসিরুল হক

শব্দ বিন্যাস
মোস্তাফা কম্পিউটার্স
১০/ই-এ/১ মধুবাগ, নয়াটোলা, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ
হাওলাদার অফসেট প্রেস, প্যারিদাস রোড, ঢাকা

মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা

প্রকাশকের কথা

মানুষের জন্য যে জীবন বিধান প্রয়োজন—বর্তমান প্রযুক্তির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেও বিজ্ঞান আমাদেরকে সে জীবন বিধান দিতে পারেনি, দিতে পেরেছে কেবলমাত্র অহীসূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান-সম্ভার।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদ এবং সাহিত্যিক হযরত মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) বিজ্ঞানের ছাত্র না হয়েও যেভাবে বিজ্ঞানের সাথে অহীসূত্রে প্রাপ্ত জীবন বিধানের বিশ্লেষণ করেছেন, তা পড়ে পাঠকমাত্রই অভিভূত না হয়ে পারবে না।

লেখক—বর্তমান সভ্যতায় মানুষকে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়েও স্বীয় বাগ্মিতার জোরে যারা ইসলামের বিপরীত দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাদের ব্যাপারে সতর্ক থেকে অহীসূত্র প্রাপ্ত নির্ভুল জীবন বিধান গ্রহণ করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছেন।

আমরা লেখকের এই আহ্বানকে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে পেরে নিজেদেরকে গৌরবান্বিত মনে করছি এবং সেই সাথে এই মহান সৃষ্টি বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে রেখে যাবার জন্যে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে লেখককে তাঁর যোগ্যতম মর্যাদায় ভূষিত করার জন্য দো'আ করছি।

সূচী পত্র

গ্রন্থাকারের কথা[১]

আমি বিজ্ঞানী নই, বিজ্ঞানের ছাত্রও ছিলাম না আমি কখনও কোন স্কুলে, কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবু আমার রচিত 'বিজ্ঞান ও জীবন বিধান' গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয়ে সুধীমণ্ডলীর হাতে পৌঁছছে। ব্যাপারটি অস্বাভাবিক মনে হলেও অসম্ভব থাকেনি।

আমি বিজ্ঞানের ছাত্র না থাকলেও জীবনের বিগত ৩০-৩৫ বছর ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞানের অনেক কিছুই আমাকে গভীর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করতে হয়েছে। এই অধ্যয়নেরই ফসল হিসেবে ১৯৭০ সনের পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে আমার লিখিত কয়েকখানি বই। আর ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে 'মহাসত্যের সন্ধানে'। এই গ্রন্থখানিও এই পর্যায়েরই রচনা।

বর্তমান বইখানির নাম থেকেই এর বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট। এতে একান্তই বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণ করা হয়েছে, মানুষের জন্য প্রয়োজন যে জীবন বিধান, তা বিজ্ঞান আমাদের দিতে পারে না। তা পাওয়া যেতে পারে কেবলমাত্র 'অহী' সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান-সম্ভার থেকে। অন্য কোথাও তার সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। শুধু তা-ই নয়, বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে রচিত বলে দুনিয়ায় যে-সব মতাদর্শ প্রচারিত হয়েছে, তা-ই হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট, নির্যাতন-নিষ্পেষণ, জুলুম-শোষণ ও অধিকার হরণের একমাত্র কারণ। দুনিয়ার মানুষকে যদি এসব থেকে মুক্তি লাভ করতে হয়, তাহলে এসবের বিভ্রান্তকারী প্রচার ও উচ্চ কণ্ঠ বক্তৃতা-ভাষণে বিমোহিত হয়ে এগুলোর পিছনে নির্বিচার দৌড় প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া অনতিবিলম্বে ত্যাগ করতে হবে এবং দৃঢ় প্রত্যয় ও ঐকান্তিক বিশ্বাস সহকারে গ্রহণ করতে হবে 'অহী'সূত্রে প্রাপ্ত জীবন বিধান।

অহীসূত্রে প্রাপ্ত একমাত্র জীবন বিধান হচ্ছে ইসলাম। ইসলামই বিশ্বমানবের জন্য একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম ছাড়া আর যে কয়টি মতবাদ জীবন বিধান হওয়ার দাবিদার, তার কোনটিই মানুষের জীবনের জন্য পূর্ণাঙ্গ বিধান হতে পারে না, তার কোনটিই নয় মানুষের জন্য কিছু মাত্র কল্যাণকর।

---

১. বইটি লেখকের জীবিতাবস্থায় ১৯৭৫ সনে লেখা। আমরা কোন রকম পরিবর্তন না করেই ছাপলাম —প্রকাশক

বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে যারা জনতাকে ইসলামের বিপরীত দিকে নিয়ে যেতে সচেষ্ট, আসলে তারা প্রতারক, ধোঁকাবাজ মাত্র। তারা মানুষের বন্ধু নয়, নয় হিতাকাঙ্ক্ষী। তাই ক্ষমতার রঙমঞ্চে এক-এক সময় এক-একজন প্রতারককে স্বীয় বাগ্মিতার জোরে জনগণকে ইসলামের বিপরীত দিকে নিয়ে যেতে দেখা যায়। কিন্তু সে যখন চরম দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও নির্মম স্বৈরাচারে সমগ্র দেশবাসীকে সর্বস্বান্ত করে দেয় এবং তার ফলে সে জনতা কর্তৃক পরিত্যক্ত ও পদদলিত হয়, তখন তার এ দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও স্বৈরাচারের মূল কারণ যে সেই ইসলাম বিরোধী মতবাদ, সে কথা জনগণকে বুঝতে দেয়া হয় না। তখন সেই একই রঙমঞ্চে মতবাদের সেই পুরানো বাসী হাতিয়ার নিয়ে আর একজন লোক বা লোকসমষ্টি আত্মপ্রকাশ করে এবং কিছু লোক নতুনভাবে সুযোগের সন্ধানে তারই চারিপার্শ্বে এসে ভিড় জমাতে শুরু করে। তখন শুরু হয় নাটকের আর এক অংকের মঞ্চায়ন। কিন্তু জনতা বিভ্রান্তির যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে যায়। তাদের চরম দুরবস্থার কোন পরিবর্তনই ঘটে না।

এর একমাত্র কারণ, মানুষ অহী-উৎস থেকে প্রাপ্ত নির্ভুল জীবন বিধান গ্রহণ করে নিজেদের জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলতে প্রস্তুত হয় না। ব্যক্তির বাগ্মিতায় বিভ্রান্ত হয়ে—সর্বহারা হয়ে—যেতেও তাদের কোন আপত্তি নেই যেন।

কিন্তু মানবতার প্রকৃত কল্যাণকামীরা কোন সময় ও কোন অবস্থায়ই মানুষকে প্রকৃত কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাতে ত্রুটি করে না। বর্তমান বইখানি সেই আকুল আহ্বান ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমি আশা করি, এই বইখানি পাঠ করে দেশের সুধী সমাজ 'বৈজ্ঞানিক মতবাদের' বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি পাবেন এবং সন্ধান লাভ করবেন মানবতার একমাত্র কল্যাণকর বিধানের, যা বিশ্বমানবের মহান সৃষ্টিকর্তাই দিয়েছেন তাদের জীবনে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে।

এ-ই হচ্ছে এ গ্রন্থের একমাত্র লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জিত হবে কিনা তা দেশের সুধীমণ্ডলীই বলতে পারেন।

গ্রন্থকার

بسم الله الرّحمن الرحيم

অনুভূতি লাভের গোড়ার কথা

মানুষের অস্তিত্ব ও ক্রমবিকাশ কতকগুলি স্বভাবজাত ও রাসায়নিক কার্যকারণের বিশেষ কার্যক্রমের ও কীর্তিকলাপের ফসল। এসব সম্পর্কে মানুষ তার মগজের অনুভূতি ও ধারণাবলীর সাহায্যে ও মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করে। এই কারণে অনুভূতি-ব্যবস্থার যান্ত্রিকতা সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা আবশ্যক। বিশ্বলোকের নিগূঢ় তত্ত্ব পর্যন্ত পৌছার জন্যে মানুষের ধারণা-কল্পনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কতখানি গুরুত্ব এবং এ পর্যায়ে বস্তুবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর কতটা নির্ভরতা গ্রহণ করা যেতে পারে, সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা গঠন করা এ উপায়েই সম্ভবপর হতে পারে।

বৈজ্ঞানিক গবেষানাগার ও পরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রসমূহের যেসব যন্ত্রপাতির সাহায্যে ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুসমূহ তথা প্রপঞ্চের (Phenomenon) পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং এ সব পর্যবেক্ষণলব্ধ তত্ত্ব ও তথ্য বিচার-বিবেচনা ও চিন্তা-গবেষণা করে যেসব মতবাদ ও প্রকল্প রচনা করা হয়, সেসবের যান্ত্রিক ভুল-ত্রুটি (Mechanical errors) গুলির উপর সর্বপ্রথম দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। এ সব যন্ত্রের সাহায্যে যেসব কথা পর্যবেক্ষণে আসে তা থেকে নির্ভুল ও যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্যে এটা একান্ত জরুরী। সেই সঙ্গে মানুষের মগজের যোগ্যতা-কর্মক্ষমতা ও ত্রুটি-অক্ষমতার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে, যেন তার সাহায্যে বিশ্বলোকের যা কিছু পর্যবেক্ষণ করা হবে তা থেকে নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়। বিশ্বলোক ও বিশ্বলোকে মানুষের স্থান কি এবং কোথায়, তা মানুষের মগজ নির্দিষ্ট করে। এই কারণে আমাদের এই যন্ত্রটির যাচাই ও পরখ করা কর্তব্য। কেননা তার অক্ষমতা ও দুর্বলতাগুলি থেকে আত্মরক্ষা করতে না পারলে প্রকৃত সত্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ধার করা কক্ষণই এবং কিছুতেই সম্ভবপর হবে না।

মানুষ তার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই তথ্যাহরণ ও জ্ঞান লাভ করে এবং এ সব তথ্য ও জ্ঞানের ভিত্তিতে ধারণা গড়ে তোলে। আমরা আমাদের চক্ষু দ্বারা দেখি, কর্ণ দ্বারা শুনি। এই দেখা ও শুনার মাধ্যমে আমরা যে তথ্য পাই, মগজ তাকে

ভিত্তি করেই এক-একটা জিনিস সম্পর্কে মনের মধ্যে এক-একটা ধারণা রচনা করে থাকে। চক্ষু চিত্র গ্রহণকারী একটা ক্যামেরার মত। চক্ষুর পর্দার উপর প্রতিটি জিনিসের ছবি ঠিক তেমনিভাবে প্রতিফলিত হয়, যেমন প্রতিফলিত হয় ক্যামেরার পর্দার উপর। ক্যামেরার পর্দা প্রতিবিম্ব গ্রহণকারী কাঁচ হলে সেই পর্দার উপর ছবি স্থায়ীভাবে মুদ্রিত হয়ে যায়। কিন্তু সেই পর্দা সেরূপ না হলে সেই জিনিসটি যতক্ষণ ক্যামেরার সামনে থাকবে ও ক্যামেরার মুখ খোলা থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই জিনিসটির ছবি ক্যামেরার পর্দার উপর দেখা যাবে। আর যখনই সে জিনিসটি সম্মুখ থেকে সরে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরার পর্দার উপর থেকেও সে জিনিসটির ছবি মুছে যাবে। চক্ষুর পর্দার স্থিত দৃষ্টি স্নায়ু (optic nerve) মগজের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই স্নায়ুর সাহায্যেই মগজ চক্ষু-পর্দার উপর প্রতিফলিত ছবির নেগেটিভ গ্রহণ করে থাকে। এই স্নায়ুটি যদি ছিন্ন করে দেয়া হয়, তাহলে চক্ষুর পর্দার উপর ছবি প্রতিফলিত হলেও মগজ তা অনুভব করতে পারবে না। এরূপ অবস্থায় সে জিনিসটির অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব সব-ই সমান হয়ে দাঁড়াবে। বস্তুত দেখা বা দর্শনের কাজটি মগজ করে, চক্ষু নয়। অনুরূপভাবে শ্রবণের কাজটিও করে মগজ, কানের পর্দা বা ডগা শুনতে পায় না। এ দুটো শুধু মাধ্যম মাত্র। এ দুটো মাধ্যমের সহিত মগজের সম্পর্ক বজায় ও সুস্থ-সবল থাকলেই তবে কাজ দুটি সম্পন্ন হয়—সম্পন্ন হয় মগজ দ্বারা। অন্যথায় চক্ষু থাকতেও মানুষ দেখতে পারে না, আর কর্ণ থাকতেও মানুষ শুনতে পারবে না। হবে অন্ধ ও বধির।

এরপর বিবেচ্য হচ্ছে, চক্ষুর পর্দার উপর যেসব জিনিসের ছবি প্রতিবিম্বিত হয়, তা কি হুবহু সেই জিনিসের স্থলাভিষিক্ত, না এ দুটির (অর্থাৎ মূল জিনিসটি এবং তার প্রতিবিম্ব বা ছবির) মাঝে কোন পার্থক্য রয়েছে? এখানে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টির বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। একটি সরল সোজা কাঠখন্ড বা বাঁশ যদি পানির মধ্যে এমনভাবে বসিয়ে দেয়া হয় যে, তার অর্ধেক পানির মধ্যে দেখা যাবে, তাহলে তা কখনই সরল-সোজা পরিদৃষ্ট হবে না। দেখা যাবে ভাঙ্গা ও বাঁকা। কিন্তু তার পূর্ণ অংশ যদি পানিতে ডুবিয়ে বসানো হয়, তাহলে তা আসলে যেমন সোজা ও সরল তেমনই দেখা যাবে। তবে পূর্বাপেক্ষা কিছুটা মোটা মনে হবে। এই কাষ্ঠ বা বাঁশটি যদি বায়ুশূন্য স্থানে রেখে দেওয়া হয়, তাহলে তা-ই অনেকটা সরু ও পাতলা দেখা যাবে। সে কাষ্ঠ বা বাঁশটি কতটা মোটা ও লম্বা তা এরূপ পর্যাবেক্ষণে কিছুমাত্র জানা যায় না। বিভিন্ন বস্তুগত পরিবেষ্টনের মাধ্যমে (medium) তার আয়তন বিভিন্ন হয়। আর মুশকিল এই যে, চক্ষুর পর্দা

ও তার উপর যেসব জিনিসের ছবি প্রতিফলিত হয়—এ দুটির মাঝে কোন-না-কোন মাধ্যম একান্তই জরুরী। সে মাধ্যম হয় বাতাস হবে, না হয় হবে পানি। অথবা তা কোন শক্ত কাঁচের অভ্যন্তরে বন্ধ হবে।

নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার থেকে আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে রেল লাইন। রেল লাইন একসঙ্গে ও পাশাপাশি দুটি সরল রেখার মত একটানাভাবে চলে গেছে। একটির সাথে অন্যটি যুক্ত ও মিলিত নয়, ভিন্ন ও স্বতন্ত্রতায় রক্ষিত। কিন্তু এক প্রান্ত থেকে তাকালে তার দূরের অংশটি পরস্পর মিলিত দেখা যাবে। দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে গিয়ে পরস্পর দূরত্বে অবস্থিত লাইন দুটি মনে হবে একটির সাথে অন্যটি মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে।

তৃতীয় একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, একই পরিমাণের দুটি বর্গক্ষেত্র সাদা কাগজের উপর পাশাপাশি আঁকা হলেও তা একটিকে সাদা রেখে অন্যটিকে মসিলিপ্ত করে দেয়া হলে কালোটির তুলনায় সাদাটি বৃহদায়তন দেখা যাবে, যদিও দুটির আয়াতনই সমান ও একই পরিমণ্ডলে ও মাধ্যমে রক্ষিত। বিশাল বালুকাময় মরুভূমির বুকে মরীচিকার দৃশ্যও এ পর্যায়েরই একটি দৃষ্টান্ত। বালুকাময় প্রান্তরের নিকটবর্তী বায়ুস্তর রৌদ্রতাপে অধিকতর উত্তপ্ত হয়ে যায়। তার উপরস্থ বায়ুর স্তর উহা অপেক্ষা কম গরম এবং তার উপরের স্তর আরও কম উত্তপ্ত থাকে। উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের গরম হওয়ার মাত্রা আনুপাতিকভাবে কম হয়ে থাকে। উত্তাপ কম হওয়ার দরুন বাতাসের আর্দ্রতা (humidity) বৃদ্ধি পায়। আর অধিক উত্তপ্ত বায়ু অধিকতর লঘু ও সূক্ষ্ম হয়ে থাকে। তার তুলনায় ঠাণ্ডা বাতাস হয় অধিক ঘন ও ভারী। এভাবে বালুকাময় প্রান্তরে দিনের বেলার বাতাসের মাধ্যম কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। দূর থেকে কোন বৃক্ষ ইত্যাদি দেখলে তার প্রতিবিম্ব বালুকাময় প্রান্তরের উপর এমনভাবে পড়ে, যেমন নদী বা পুকুর-পাড়ে দণ্ডায়মান কোন গাছের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় পানির বুকে। দূর থেকে একজন লোক সহজেই মনে করে বসবে যে, মরু প্রান্তরে দণ্ডায়মান এ বৃক্ষটির পাশেই রয়েছে স্বচ্ছ পানিতে পূর্ণ-কোন পুকুর বা জলধারা। এ মনে করে সে যখন তার নিকট উপস্থিত হয় তখন সে স্পষ্ট বুঝতে পারে যে, সে প্রতারিত হয়েছে। এই দৃশ্যকেই বলা হয় মরীচিকা।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পর্যবেক্ষণকেন্দ্রে লক্ষ্য করা যায়, আলোর রশ্মিসমূহ যতক্ষণ পর্যন্ত একই ধরনের মাধ্যমের মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়, ততক্ষণ তার পথ থাকে সরল ও সোজা। কিন্তু তাকে যদি একটি মাধ্যম থেকে অন্য একটি

মাধ্যমে প্রবেশ করতে হয়, তাহলে রশ্মিসমূহের পথ পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন একটা জিনিস পানির মধ্যে রাখা রয়েছে আর আমরা সেটিকে বাহির থেকে দেখছি। সে জিনিসটি থেকে আলোর রশ্মিসমূহ চলে যখন আমাদের চক্ষেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করে, আমরা তখনই তা দেখতে পাই। তা যখন চোখের ভিতরে প্রবেশ করে, তখন তাতেও সেগুলিকে তিন প্রকারের মাধ্যম অতিক্রম করতে হয়। তার পরই গিয়ে তা চোখের পর্দার উপর পড়তে পারে। আমরা যেহেতু আলোর রশ্মির সাহায্যেই সব জিনিস দেখি এবং সেগুলির বাহ্যিক আকার-আকৃতি সম্পর্কে ধারণা গড়ে তুলি। ওদিকে রশ্মিসমূহের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তা মাধ্যমের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের পথও পরিবর্তন করে ফেলে। এই কারণে আমরা কখনই কোন জিনিসের আসল আকার-আকৃতি ও সংগঠন সম্পর্কে জানতে পারি না। আমরা যা কিছু দেখি, তা হুবহু আসল জিনিসটি নয়, সেই আসল জিনিসের সংশোধিত রূপ ও আকার-আকৃতি মাত্র।

এসব দৃষ্টান্ত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে একটি কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। মানুষ যেসব জিনিস নিকট থেকে দেখে, দেখে কোনরূপ যন্ত্র বা মাধ্যম ছাড়াই তখনও সে-সবের আসল আকার-আকৃতি বলতে যা বুঝায় তা দেখতে পায় না। আর দূরবর্তী জিনিসসমূহ সম্পর্কে একথা অতীব বিস্ময় উদ্দীপক যে, রাত্রি বেলা আকাশগুলে যেসব তারকা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, সেগুলি যে স্থানে দেখা যায়, সেই স্থানেই সেগুলো এখনও আছে—একথা নিশ্চিত করে বলা চলে না। কেননা এ সব নক্ষত্র থেকে আলোর যে রশ্মিসমূহ আজ থেকে ত্রিশ-চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছর পূর্বে যাত্রা শুরু করেছিল, সেই সব রশ্মিই আমাদের চক্ষেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করে সে নক্ষত্রগুলির ছবি আমাদের চোখে প্রতিফলিত করে। এ রশ্মিসমূহের রওয়ানা হওয়ার পর যখন এতগুলি বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, তখন সে তারকাগুলো এখন যেখানে অবস্থিত দেখা যায়, সেগুলো এখনও সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে—আবর্তিত হয়ে বহু দূরে অন্য স্থানে সরে যায়নি, তা কোনক্রমেই নিশ্চিত করে বলা যায় না। শুধু তা-ই নয়, সেগুলোর অস্তিত্ব এখনও আছে কিনা, তা-ও নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহ নয়। কেননা সেগুলো হয়ত এতদিনে ধ্বংস-ই হয়ে গেছে, হতে পারে, আকাশলোক থেকে সেগুলো কোন এক সময় বিলীন হয়ে গেছে। অন্তত তা অসম্ভব তো কিছু নয়। এ তারকাগুলো আমরা দু'চারজন লোকই শুধু নই, সমগ্র পৃথিবীর মানুষ একই দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছে। তাহলে এগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কারণ কি? কি করে বলতে পারি যে, তারকাগুলোর অস্তিত্ব এতদিনে নিঃশেষ ও বিলীন হয়ে গেছে? হ্যাঁ, তা বলা

যায়। তার কারণ রয়েছে। আর সে কারণ হলো, আলোক রশ্মিসমূহ প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল গতিতে চলে। নক্ষত্রগুলো এত দূরে অবস্থিত যে, সেখান থেকে পৃথিবীতে রশ্মিসমূহের পৌঁছতে এত দীর্ঘ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে।

এ প্রেক্ষিতে আমরা অতি সহজেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আমরা যা কিছু দেখতে পাই, তা তার একটা রূপক রূপ বা প্রতিবিম্ব মাত্র, প্রকৃত ও মৌল সত্তার সাথে তার কোনই সম্পর্ক নেই। এই কারণে নিজেদের পর্যবেক্ষণসমূহ বর্ণনা করায় কিংবা অন্যদের পর্যবেক্ষণসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনে উপযুক্ত নিগূঢ় তত্ত্ব কথাটি অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে। কেননা আমরা অনুভূতির সাহায্যে যা কিছু আয়ত্ত করি, তা একটা ছবি মাত্র। তা কখনও আসল ও প্রকৃত জিনিসের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। আসল ও প্রকৃত জিনিসের অনেকগুলি দিক-ই সেই প্রতিফলিত ছবিতে অপ্রকাশিতই থেকে যায়।

এমনিই তো কোন জিনিসের ছবি তোলা হলে সে জিনিসটির প্রকৃত সত্তা ও তার ছবির মাঝে স্বভাবতই পার্থক্য থেকে যায়। এ পার্থক্যের দিকেও যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখা হয়, তবুও সে ছবিতে জিনিসটির কেবলমাত্র একটি দিকই উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, তা-ও পূর্ণ মাত্রায় আসে না, অনেকগুলি দিকই এমন উহ্য ও অদৃশ্য থেকে যায়, যে সম্পর্ক ছবি থেকে কক্ষণই এবং কিছু মাত্র ধারণা করা যায় না। অনুরূপভাবে আমরা যখন কোন একটা জিনিস দেখি, তখন প্রথম দৃষ্টিতে তার কেবলমাত্র একটি দিকই দেখি, তার অনেকগুলো দিকই আমাদের চোখের অন্তরালে থেকে যায়। কেবল এইটুকুই নয়, সেই একটি দিকের পর্যবেক্ষণেও অনেক অনেক দোষ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যায়। সেই জিনিসটির সেই একটি দিকই নিকট থেকে দেখলে যা কিছু প্রকাশ পায়, দূর থেকে দেখলে প্রকাশিত হয় অন্য কিছু। সাধারণভাবে দেখলে এক রকম মনে হয় আর গভীর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে ভিন্নতর দৃশ্যই চোখে পড়ে। ক্ষুদ্র স্থানে রেখে দেখলে সে জিনিসটি সম্পর্কে যে-অনুভূতি হয়, সেটিকে বড় জায়গায় রেখে দেখলে সেই অনুভূতি জাগে না। বাতাসের মধ্য হতে দেখলে সে জিনিসটি যেরূপ পরিদৃষ্ট হয়, পানির মধ্যে রেখে দেখলে তা কিছুতেই সেরূপ পরিলক্ষিত হবে না। শূন্যতার মধ্যে রেখে দেখলে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক রূপে প্রতিভাত হবে। এ হলো কোন জিনিসের কেবল মাত্র একটি দিককে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে বিচার-বিবেচনা করার অবস্থা। এ দৃষ্টিতে সেই জিনিসের অন্যান্য সমগ্র দিককে এই সব দৃষ্টিকোণে বিচার-বিবেচনা করার অবস্থা যে কি দাঁড়াতে পারে তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। এ প্রেক্ষিতে

একটি কথাই সুস্পষ্ট। তা হলো, এরূপ পর্যবেক্ষণের দ্বারা কোন জিনিসের আসল রূপ বুঝতে পারা কিছুতেই সম্ভবপর নয়।

পর্যবেক্ষণের মানদণ্ড

এই পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে তা হলো সরাসরি ও কোনরূপ যন্ত্র বা মাধ্যমের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করার বিভিন্ন পন্থা ও তার ফলাফলের কথা। এতদ্ব্যতীত পর্যবেক্ষণের আরও কতগুলি উপায় ও মাধ্যম রয়েছে, যার দ্বারা বস্তুসমূহের বিভিন্ন অবস্থা জানা যায়। একটি বস্তুর প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণ এক ধরণের অনুভূতি সৃষ্টি করে। সেই জিনিসের রাসায়নিক পর্যবেক্ষণ সৃষ্টি করে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের অনুভূতি।

প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণ

প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণ বলতে বোঝায় কোন একটা জিনিস চোখ দিয়ে দেখা ও কান দিয়ে কিছু শোনা। দর্শন ও শ্রবণই হলো এর সারকথা। দর্শন ও শ্রবণের জন্য মানুষের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তিকে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রের সাহায্যে অধিকতর বলিষ্ঠ সুতীক্ষ্ম সুদূরপ্রসারী করে তোলা হয়। এ সব যন্ত্রের সাহায্যে এমন সব জিনিস দেখতে পারা যায়, যা সেসব যন্ত্র ছাড়া কক্ষণই এবং কিছুতেই দেখা যায় না। আমাদের চারপার্শ্বে বাতাসের ও পানিতে বহু সংখ্যক অণু ও জীবাণু রয়েছে, তাদের পরিমাণ বা সংখ্যা গণনা করার কারোর সাধ্য নেই। আর আমরা সেগুলো অনুভবও করতে পারি না। কিন্তু অণুবীক্ষণের (microscope) সাহায্যে দেখলে আমরা সেগুলো অতি সহজেই দেখতে পারি। অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবার বিভিন্ন মানের শক্তিসম্পন্ন হয়ে থাকে। কোন কোন জীবাণু এতই ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম যে, তা স্বল্প শক্তিসম্পন্ন অণুবীক্ষণে কখনই দেখা যেতে পারে না। অধিকতর শক্তিশালী অণুবীক্ষণ দ্বারা তা অবশ্যই দেখা যেতে পারে। এসব অণুবীক্ষণ জীবাণুসমূহকে কয়েক হাজার গুণ বড় করে দেখিয়ে দেয়। অন্যান্য সূত্রে এমন অনেক জিনিসেরই অস্তিত্ব জানা গেছে, যেগুলি অণুবীক্ষণ যন্ত্রও দেখাতে পারে না। এটা অসম্ভব নয় যে, আমাদের চারপার্শ্বে এমন অণু বর্তমান রয়েছে, যা এখন পর্যন্ত কোন কিছুর মাধ্যমেই পর্যবেক্ষণে আসেনি। কিন্তু বিজ্ঞানের জগতে সেগুলোর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। বিজ্ঞানী কখনই কোন জিনিস সম্পর্কে একথা বলতে পারে না যে, অমুক জিনিসটির অস্তিত্ব নেই। কেননা সে বরাবর দেখতে পাচ্ছে গতকাল যে জিনিস দেখা যায়নি, আজ তা চোখের সামনে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত। অনুরূপভাবে আজ পর্যন্ত যে জিনিসটি দেখা যায়নি, সেটি ভবিষ্যতে যে কোন

সময় এমন একটা মাধ্যমের সাহায্যে দৃশ্যমান হয়ে উঠবে, সে মাধ্যমটি এখন পর্যন্তও আবিষ্কৃত হয়নি। আণুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণই বিজ্ঞানীদের মনে এই ধারণা ও চিন্তা-বিশ্বাস জাগিয়ে দিয়েছে। নতুবা যেসব লোক এসব উপায় বা মাধ্যম সম্পর্কে কিছুই জানে না কিংবা সেগুলো সম্পর্কে শুধু শুনতেই পেয়েছে মাত্র, তারা একথা এখন পর্যন্ত মেনে নিতে রাজী নয় যে, যে জিনিস আমাদের ধরা-ছোঁয়া দেখা-শোনার আওতার মধ্যে নেই, তারও অস্তিত্ব হওয়া ও বর্তমান থাকা সম্ভবপর এবং ভবিষ্যতের কোন এক সময় তা আমাদের ধরা-ছোঁয়া বা দেখা-শোনার আওতার মধ্যে এসে যেতে পারে। উক্ত লোকেরা এমন কোন জিনিসের অস্তিত্বকে মেনে নিতে আদৌ প্রস্তুত নয়।

রাসায়নিক পর্যবেক্ষণ

বস্তুসমূহের রাসায়নিক পর্যবেক্ষণ আশ্চর্য ধরনের ফলাফল প্রদর্শন করে। কিন্তু তার কোন প্রভাব মানুষের অনুভূতির উপর পড়ে না, যেমন পড়ে সগুলোর প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণের দরুন। রাসায়নিক পর্যবেক্ষণের অর্থ রাসায়নিক পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ। কোন বস্তু বা পদার্থের রাসায়নিক অংশ ও বিশেষত্ব সমূহ সম্পর্কে তত্ত্ব ও তথ্য লাভই হলো তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ বা পর্যবেক্ষণ। একটি হীরার টুকরার প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণ মানব-মগজে তার উজ্জ্বল সুন্দর ও শক্ত-কঠিন হওয়ার অনুভূতি জাগিয়ে দেয়। এ দৃষ্টিতে হীরা অত্যন্ত বিস্ময়কর ও বহুমূল্য জিনিস মনে হয়। কিন্তু তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ বলে দেয় যে, তা কার্বনেরই একটি রূপ। আর কার্বন হচ্ছে কয়লারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বরং কয়লা পুরাপুরি কার্বন ছাড়া আর কিছুই নয়। কার্বন-অণুর এক বিশেষ বিন্যাস ও সংঘটনেই হীরা গড়ে উঠে। এই বিন্যাস ও সংঘটনের কারণেই হীরায় এক প্রকার ঔজ্জ্বল্য, চাকচিক্য ও কাঠিন্যের সৃষ্টি হয়। নতুবা তা কার্বন অণুর এক বিশেষ সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক-বিজ্ঞানীরা পানিকে একটা অন্যতম মৌল উপাদান মনে করতেন এবং পানি-আগুন-মাটি-বাতাস-এই চারটি মৌল উপাদানে মধ্যেই তা গণ্য হতো। রাসায়নিক পর্যবেক্ষণে প্রমাণিত হয়েছে যে, পানি একটা সংমিশ্রিত পদার্থ (compound)। এ বিশ্লেষণে জানা গেছে যে, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন—এই দুইটি মৌল উপাদানের রাসায়নিক সংমিশ্রণের ফলেই পানির উৎপত্তি। মাটির রাসায়নিক পর্যবেক্ষণ বলে দেয় যে, তা বহু সংখ্যক রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণ। বাতাস বহু কয়টি মৌল উপাদানের সংমিশ্রণ মাত্র। আর আগুন বিশেষ কোন পদার্থ নয়, একটা শক্তি (energy) মাত্র।

আণবিক ও পারমাণবিক পর্যবেক্ষণ

আণবিক (molecular) পর্যবেক্ষণ বলে দেয়, শক্তভাবে জড়িভূত ও সুসংবদ্ধ অণুসমূহের মাঝেও শূন্যস্থান থেকে যায়। পরিভাষায় তাকে বলা হয় আণবিক শূন্যস্থান (molecular space)। কিন্তু সেই জিনিসের প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক পর্যবেক্ষণে সে শূন্যতা ধরা পড়ে না। বস্তুত আণবিক পর্যবেক্ষণ না হওয়া পর্যন্ত আণবিক শূন্যস্থানের অস্তিত্ব মেনে নেয়া সম্ভব হয় না। কোন একটা জিনিস—তা যে অবস্থায়ই থাক-না-কেন, তা জমাট বাঁধা অবস্থায় থাক, তরল হোক বা গ্যাস আকারে হোক—চূর্ণ করে তাকে ক্ষুদ্র থেকেও ক্ষুদ্র অণুতে বিভক্ত করে দিলে জানা যায় যে, এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু অতপর আর বিভক্ত হতে পারে না। একেই বলা হয় 'আণবিক বিশ্লেষণ'। প্রতিটি জিনিসের অণুতে সেই সব পদার্থ বিষয়ক ও রাসায়নিক বিশেষত্বই রয়েছে, যা আছে সেই গোটা জিনিসে। অনেক দিন পর্যন্তই এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, বস্তুগুলিকে কেবল মাত্র তার অণুতে বিভক্ত করা সম্ভব। যে অণুগুলিকে বিভক্ত করা সম্ভব নয়, এই অণুসমূহই হচ্ছে বস্তুর 'মৌল একক' (basic unit)। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারসমূহে এমন একটা সময় এল, যখন দেখা গেল অণুও চূর্ণ হচ্ছে, চূর্ণ করা সম্ভব। পূর্বে যে কাজ ছিল অসম্ভব, বর্তমানে তাই সম্ভবপর হচ্ছে। অণু সম্পর্কে পূর্বে যে অনুভূতি ছিল, এক্ষণে তা বিলীন হয়ে গেল। এখন সম্পূর্ণ ভিন্নতর এক অনুভূতি জাগল সে সম্পর্কে। এই অণুগুলি যখন চূর্ণ করে দুটি করা হলো, তখন সে দুটি ছাড়া আরও দুটি বিস্ময়কর পর্যবেক্ষণ সামনে এল। প্রথম হচ্ছে, এই খণ্ডসমূহ এককভাবে নিজেদের অস্তিত্বরক্ষা করতে পারেনি আর দ্বিতীয় হচ্ছে, উভয় খণ্ডই বিভিন্ন বিশেষত্ব সম্পন্ন। পানির আণবিক (molecular) পর্যবেক্ষণ পানিরই বিশেষত্ব প্রকাশ করে। কিন্তু পানির পারমাণবিক (atomic) পর্যবেক্ষণে পানির বিশেষত্ব প্রকাশ করে না। দুটি নতুন ভিন্নতর বিশেষত্ব উদ্ঘাটিত হয়। পানির পারমাণবিক পর্যবেক্ষণে জানা যায়, পানির একটি অণু (molecule) দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণুর সংমিশ্রণ। হাইড্রোজেনের বিশেষত্ব ও অক্সিজেনের বিশেষত্বে আকাশ-পাতালের পার্থক্য। খাবার লবণের পারমাণবিক বিশ্লেষণ বলে দেয়, তা সোডিয়াম পরমাণু (sodium atom) ও ক্লোরিন পরমানুর (chlorine atom) সংমিশ্রণ। (chlorine a heavy gas (c) of yellowish-green colour used in disinfeecting, bleaching and poison-gaswarfare)

বস্তুত খাবার লবণ সোডিয়াম ও ক্লোরিন দুটি অণুর সংমিশ্রণে তৈরী। 'সোডিয়াম' হাতে লাগলেই হাত জ্বলে উঠে আর 'ক্লোরিন' বিষাক্ত গ্যাস পরমাণু

সংমিশ্রিত, আর পানির অণু হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনও নিতান্তই গ্যাস ছাড়া আর কিছুই নয়। পারমানবিক পর্যবেক্ষণের সাহায্যেই একথা জানা গেছে যে, এসব খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য কার্বন-অক্সিজেন-হাইড্রোজেন ছাড়া আর কিছুই নয়। পারমাণবিক পর্যবেক্ষেণের এ পদ্ধতি যদি মানুষের অজ্ঞাতই থেকে যেত, তাহলে এ তত্ত্ব কি মানুষের নিকট কোন দিনই ধরা পড়ত আর মানুষ কি কোন দিনই তা বিশ্বাস করত?

সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি

মানুষের অনুভূতিমূলক পর্যবেক্ষণের বিভিন্ন অবস্থা ও পদ্ধতি ছাড়াও মানুষের সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি (common sense)-ও মানবীয় চিন্তা-বিশ্বাস ও মতবাদ রচনার ভিত্তি বা উপায় হতে পারে। একারণে সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিরও তাত্ত্বিক আলোচনা করা আবশ্যক। সাধারণ ও সহজ দৃষ্টিতে পৃথিবীকে সমতল দেখায়। এটা সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিরও ব্যাপার। কিন্তু পৃথিবীর গোলাকৃতি সম্পর্কে বহু অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। বাহ্যত পৃথিবীকে স্থির ও সূর্যকে তারই চতুষ্পার্শে আবর্তনশীল দেখা যায়। একটা তীক্ষ্ণ শানিত ক্ষুরের ধার সরল সোজা হয়। এও সাধারণ দৃষ্টিরই ফল। কিন্তু অণুবীক্ষণ বলে, তা বাঁকা ও অসরল। সাধারণ বুদ্ধি বলে, ইস্পাতের একটি খণ্ড অত্যন্ত শক্ত ও অনমনীয় হয়। কিন্তু রঞ্জনরশ্মি থেকে জানা যায়, তার মধ্যে অনেক ফাঁক রয়েছে। আর পারমাণবিক পর্যবেক্ষণ বলে যে, তা কোটি কোটি এমন পরমাণুর (atoms) সমষ্টি, যা নিজ নিজ স্থানে এক-একটা সৌরলোকের নিদর্শন পেশ করে এবং তা অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে নিত্য আবর্তনশীল। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি অন্যটিকে স্পর্শ মাত্র করে না, একটির সাথে অন্যটির একবিন্দু সংঘর্ষ লাগে না।

মানুষের বিবেক-বুদ্ধির অসারতা

কোন একটি জিনিসের পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়নের যদি এত বেশী বিভিন্ন পন্থা পদ্ধতি থাকে এবং তাতে সে জিনিসটির নতুন নতুন রূপ প্রকাশ পেতে থাকে, তাহলে সে জিনিসটির মৌল তত্ত্ব সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কি উপায় হতে পারে? যে লোকের এসব পন্থা ও পদ্ধতি আদৌ জানা নেই, সে হয়ত নিজের মনমত একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে যেতে পারে এবং একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে দাবিও করতে পারে। সে এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নানা চিন্তা ও মতাদর্শের প্রাসাদ নির্মাণ করতে পারে। কিন্তু যে লোক নিজে একটি জিনিসের বিভিন্ন দিককে বিভিন্নভাবে যাচাই করে বিভিন্ন পরিণতিতে উত্তরণ লাভ করেছে, সে কখনই সে

জিনিসটির মৌল তত্ত্ব সম্পর্কে কোন অটল অবিচল সিদ্ধান্ত কিছুতেই গ্রহণ করতে পারে না। এ প্রেক্ষিতে বিবেচ্য বিষয় হলো, দুনিয়ার একটি সাধারণ বস্তু সম্পর্কে যখন কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নয়, দৃঢ়তার সহিত যখন বলা যায় না যে, এ-ই হচ্ছে সে জিনিসটির প্রকৃত তত্ত্ব ও মৌল সত্য; তা সমগ্র বিশ্বলোক সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত ও সর্বশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছা কি করে সম্ভবপর হতে পারে? আর যেসব সমস্যার উপর দর্শন ও সমাজ সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত, সেগুলোর প্রকৃত ও চূড়ান্ত সমাধান কি করে সম্ভবপর হতে পারে? অথচ এসব সমস্যার সমাধান করা না হলে মানবীয় ব্যক্তিত্বের সর্বমুখী বিকাশের ক্ষেত্রে রচনাকারী এক সুসংবদ্ধ ও সর্বাত্মক জীবন বিধান রচনা করাও সম্ভবপর হতে পারে না।

জীবন ব্যবস্থার স্থায়ী ও সুদৃঢ় ভিত্তি ও মৌলনীতি রচনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয় সমাধান লাভ করা সর্বপ্রথম একান্তই জরুরী।

১. বিশ্বলোকের নিগূঢ় সত্য;

২. বিশ্বলোক কি করে অস্তিত্ব লাভ করল;

৩. কিভাবে এই বিশ্বলোক চলমান ও অস্তিত্ব সম্পন্ন হয়ে আছে;

৪. কোন্ সব নিয়ম-শৃঙ্খলা বিশ্বলোকের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক রক্ষা করে চলছে;

৫. এর সূচনা কি করে হলো এবং এর পরিণতিই বা কি হতে যাচ্ছে;

৬. এই বিশাল বিশ্বলোকের সাথে মানুষের স্থান কোথায়—'পজিশন' কি;

৭. এই বিশ্বলোকে মানুষের কি সম্পর্ক;

৮. এই জীবনের পর আরও কোন জীবন আছে কি?

এ এমন সব প্রশ্ন, এমন ধরনের সমস্যা এগুলো, যে বিষয়ে নির্ভুল ও চূড়ান্ত সমাধান মানুষ নিজের জ্ঞান-গবেষনা ও পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কখনও লাভ করতে পারে না। সে জন্য প্রয়োজন হচ্ছে এমন এক মহান সত্তার প্রত্যক্ষ পথ প্রদর্শন, যিনি বিশ্বলোকের সবকিছু জানেন। তার এক-একটি অংশের সমস্ত দিক ও প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে অবহিত। কেবল এই বিশ্বলোকই নয়, বিশ্বলোকের বাইরে যা কিছু, সেই সব বিষয়েও তিনি পূর্ণ মাত্রায় জ্ঞাত। কোন মানুষ যে এই ধরনের জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য।

এতদসত্ত্বেও বহু লোক এমন রয়েছে, যারা মানুষের আনুভূতিক যন্ত্রকে প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের নির্ভরযোগ্য সূত্র ও উপায় বলে ধরে নিয়েছে। তাদের মতে মানুষের নিছক বিবেক-বুদ্ধির ফয়সালাই চূড়ান্ত ও অটল। তারা এ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই একটা কাল্পনিক জগত গড়ে তোলে। আর এ জগতে যা কিছু তাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, তার অস্তিত্বকেই তারা অস্বীকার করে বসে। অথচ তারা জানে এবং মেনেও নেয় যে, মানুষের নিজস্ব পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে গড়া ধারণা ও চিন্তা-বিশ্বাসকে কখনই নির্ভুল ও চূড়ান্ত বলে মেনে নেয়া যায় না।

প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ

মানুষ যে দিন থেকেই দুনিয়ার বুকে অস্তিত্বসম্পন্ন, সেদিন থেকেই দুনিয়ায় পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ নিরীক্ষণের কর্মধারা অব্যাহতভাবে চলছে। মানুষ আজ পর্যন্ত যত কিছুই পর্যবেক্ষণ করেছে, সে বিষয়ে গভীর চিন্তা-বিবেচনা ও গবেষণা চালিয়ে যেসব ধারণা ও মতবাদ রচনা করেছে, সেই সমস্ত কথাকেই সামষ্টিকভাবে আধুনিক পরিভাষায় বলা হয় বিজ্ঞান (science)। অন্য কথায়, মানুষ বিজ্ঞানের যে প্রাসাদ দাঁড় করিয়েছে, তার ভিত্তিপ্রস্তর হচ্ছে সেসব আনুভূতিক পর্যবেক্ষণ, যা প্রাকৃতিক প্রপঞ্চের প্রাকৃতিক, পদার্থিক, রাসায়নিক, আণবিক ও পারমাণবিক প্রভৃতি অধ্যয়ন থেকে অর্জিত হয়েছে। এ সর্ব পর্যবেক্ষণকে সেগুলোর পরিমাণ ও গুণ অনুপাতে সুসংবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় নিয়ম-প্রণালী রচিত হয়েছে। পরে তার উপর ধারণা, অনুমান ও মতবাদের স্তম্ভ দাঁড় করা হয়েছে। বিজ্ঞানের প্রাসাদ এ ভাবেই সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে গিয়েছে, বর্তমানেও অগ্রসর হয়ে চলেছে। এ ধারাবাহিকতার কোন শেষ বা সমাপ্তি নেই।

বিজ্ঞানের এই অসম্পূর্ণ ও শেষহীন ধারাবাহিকতার সাহায্যেই বিশ্বলোকে সংঘটিত রকম-বেরকমের প্রপঞ্চের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়। যখন কোন নবতর প্রপঞ্চের (phenomenon) লোকদের পর্যবেক্ষণে আসে, যা ইতিপূর্বে কখনও লোকদের পর্যবেক্ষণে আসেনি এবং প্রতিষ্ঠিত মতবাদ ও দৃষ্টিকোণে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যায় না, তখন পূর্ববর্তী নিয়ম-প্রণালী ও মতবাদের স্তম্ভ চূর্ণ করে দেয়া হয় এবং সে প্রাসাদে নতুন স্তম্ভ দাঁড় করে দেয়া হয়। এভাবেই বিজ্ঞানের মতবাদ ও নিয়ম-প্রণালী পরিবর্তিত হতে থাকে। এখানে কোন একটি মতবাদও চূড়ান্ত ও চিরন্তন নয়। বিজ্ঞানের কোন নিয়মও নয় শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়। শুধু তা-ই নয়, বিজ্ঞান প্রতিটি বস্তুর প্রতিটি দিককে সুস্পষ্ট করে তুলতেও সক্ষম নয়। কিন্তু আমরা তো এই বিজ্ঞানের দেয়া মতবাদের আলোকেই বিশ্বপ্রকৃতির প্রপঞ্চের কার্যকারণ নির্দিষ্ট করতে চেষ্টা করতে থাকি।

অথচ সে সবের সংঘটিত হওয়ার প্রকৃত ও মৌল কার্যকারণ আমাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর হতে পারে, হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা আমাদের এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও প্রকৃতিক প্রপঞ্চের নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপরই অবিচল আস্থা ও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে বসে থাকি। তখন আমরা মনে করতে শুরু করি যে, এসব কার্যকারণ যদি আমরা সংগ্রহ করে নিতে পারি, তাহলে সেসব প্রাকৃতি প্রপঞ্চ আমরা নিজেরাই সৃষ্টি করতে সক্ষম হব। এখানে এসে আমরা ভাবতে শুরু করি যে, সমগ্র বিশ্বলোকের অস্তিত্ব এমনিভাবেই সম্ভব হচ্ছে । তার অস্তিত্বের জন্য কোন অতি-প্রাকৃতিক (supernatural) শক্তির প্রয়োজন নেই; নেই তার কোন গুরুত্ব। তাহলে আল্লাহ্ আছেন, একথা মেনে নেয়া হবে কেন? তার প্রয়োজনই বা কি আর যৌক্তিকতাই বা কি?

প্রপঞ্চের কার্যকারণ

বিশ্বলোকে যেসব প্রপঞ্চ (phenomenon) সংঘটিত হতে থাকে কিংবা মানুষ কর্তৃক যেসব কাজ সংসাধিত হতে থাকে, সেগুলির বাহ্যিক কার্যকারণের সন্ধান করে বের করা খুবই সহজ কাজ মনে হয়। কিন্তু সাধারণ বোধ্য দৃষ্টিকোণেও কোন প্রপঞ্চ বা মানুষের কোন কাজ সম্পর্কে চিন্তা-বিবেচনা করে তার প্রকৃত ও মৌল কারণের খোঁজ করা হলে এ চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যাপদেশে একের পর এক কার্যকারণের একটা শেষহীন ধারাবাহিকতা সম্মুখে আসবে এবং জানা যাবে যে, প্রতিটি কারণই এই একটি কাজ বা ঘটনার নিছক একটা আংশিক কারণ মাত্র। তার মধ্যে কোন একটিও প্রকৃত ও মৌল কারণ হওয়ার অধিকারী হতে পারে না। এই কথাটি অধিকতর সুস্পষ্ট করে বুঝবার জন্য এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করা যাচ্ছে।

বজ্রপাতে কারোর ধ্বংস হওয়া

বজ্রপাত হলো এবং তাতে মাঠে বা জঙ্গলে একজন রাখাল মৃত্যুবরণ করল। এই বজ্রপতন ও রাখালের মৃত্যু একটা ঘটনা মাত্র। কিন্তু এই ঘটনার মূলে কি কারণ নিহিত রয়েছে, তা বিশ্লেষণ করা হলে বাহ্যত ও প্রথমত মনে হবে, বজ্রপাত হওয়ায়ই রাখালের মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে। তার অর্থ দাঁড়ায়, যদি বজ্রপাত না হতো, তাহলে রাখালের মৃত্যু হতো না। রাখালের মৃত্যুর যতগুলি কারণ হতে পারে, তার মধ্যে বজ্রপতনই হচ্ছে তাৎক্ষণিক ও সুস্পষ্ট কারণ। কিন্তু তা-ই কি তার প্রকৃত ও আসল কারণ? ...কক্ষণ-ই নয়। এ একটি প্রপঞ্চ। এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে দেখুন। বজ্রটি কেবলমাত্র রাখালটিকে মারবার জন্যই

পড়েছিল, একথা কি কেউ বলতে পারে? সাধারণ বুদ্ধি বলে বজ্রটির পতনের কারণ তো অন্য কিছু। রাখালকে মারবার উদ্দেশ্যেই বজ্রপাত হয়েছিল—একথা সাধারণ বুদ্ধিতে আসে না। যেসব কারণে বজ্রপাত হয়েছে তা সব-ই তার পতনের পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল, রাখাল মাঠে যেত আর না-ই যেত, তবুও সেসব কারণে বজ্রপতন তো হতো-ই। কাজেই বজ্রপতনকে রাখালের মৃত্যুর কারণ বলা যেতে পারে না। বরং বলা যায়, রাখাল যদি সেখানে না যেত তাহলে বজ্রপতন হলেও তাতে রাখালের মৃত্যু ঘটত না। তাহলে রাখালের সেখানে যাওয়াটাই তার মৃত্যুর একটা কারণ! কিন্তু রাখাল সেখানে গেল কেন?...... তারও মূলে বহু কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে একটা বাহ্যিক কারণ তো এ-ই হতে পারে যে, সেখানে তার গরু-ছাগলের জন্য প্রচুর ঘাস ইত্যাদি বর্তমান ছিল। কিংবা সেখানে বহু গাছপালা ছিল বলে সে সেখানে কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় নিয়েছিল বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য। তাহলে বলা যেতে পারে যে, আশ্রয় নিয়েছিল বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য। তাহলে বলা যেতে পারে যে, আশ্রয় নিতে সেখানে যাওয়াটাই তার মৃত্যু ও ধ্বংসের একটা কারণ। কেননা আশ্রয়ের প্রয়োজন না হলে তো সে সেখানে যেত না। আর সেখানে না গেলে তার মৃত্যুও সংঘটিত হতো না।

কিন্তু আশ্রয় নেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল কেন? বৃষ্টি হচ্ছিল বলে বৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচাবার প্রয়োজন বোধ হয়েছিল। তাহলে বলা যায়, বৃষ্টি না হলে তার আশ্রয় লওয়ার প্রয়োজন হতো না এবং গাছের তলায় গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য সে দাঁড়াতও না। আর তাহলে বজ্রপতনে তাঁর মৃত্যুও হতো না।....এ বিশ্লেষণে রাখালের মৃত্যুর কারণের ধারা দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। একটি শাখা বৃষ্টি পতনের দিকে চলে গেছে আর দ্বিতীয় শাখাটি চলে গেছে রাখালের গরু-ছাগল লয়ে ঘর থেকে বের হয়ে মাঠে চলে যাওয়ার দিকে।

দ্বিতীয় ধারায় তার মৌল কারণের সন্ধান করা হলে সর্বপ্রথম প্রশ্ন উঠবে রাখাল সে সময় গরু-ছাগল নিয়ে ঘর থেকে বের হলো কেন? বের না হলে তো আর সে মরত না। বের হওয়ার কারণ এ হতে পারে যে, বেশ কিছু দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছিল, তার গরু-ছাগলগুলিকে খেতে দেবার মত কোন পশু-খাদ্য জমা ছিল না তার কাছে। ফলে কিছু দিন না-খেয়ে থাকার দরুন পশুগুলি মরণাপন্ন হয়ে পড়েছিল। তখন খাবার না দিলে পশুগুলিকে বাঁচাবার কোন উপায় ছিল না। সে কারণে সে সেগুলিকে নিয়ে মাঠে বের হতে বাধ্য হয়েছিল। এ-ও হতে পারে যে, কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে রাখাল বাইরে বের হওয়ার একটা সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। অবশ্য এ কথা বলা যেতে পারে যে, রাখাল যদি

সংখ্যায় এত বেশী পশু না রাখত, দু-একটা পশু থাকত তার, তাহলে সে ঘর থেকে বের না হয়েও পারত এবং এভাবে অপঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হতো না তাকে। বলা যেতে পারে—সে রাখালগিরি করতেই বা গেল কেন? রাখালগিরি করাই হয়ত তার পেশা ছিল। প্রতিটি মানুষকেই রুজি রোজগারের জন্য একটা না-একটা পেশা তো অবলম্বন করতেই হয়। সে অন্য কোন উপায় না পেয়ে পশু পালনকেই জীবিকার উপায় হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। আর পশু পালন তো মানুষের একটা প্রাচীনতম ও আদিমতম জীবিকার উপায়রূপে গণ্য হয়ে আছে। কিছু লোক অবশ্য বলতে পারে, জীবিকার উপায়রূপে একটা কিছু গ্রহণ করারই বা প্রয়োজন কি? জবাবে বলা যায়, জীবিকার উপায় গ্রহণ না করলে মানুষ খাবে কি, বাঁচবে কি করে? এর উপর পাল্টা প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, মানুষের খাওয়া-পরার প্রয়োজন দেখা দিল কেন? বলা যেতে পারে, মানুষের জন্ম-ই হয়েছে এভাবে যে, তাকে খাওয়া-পরা করেই বাঁচতে হবে। কেন মানুষের এরূপ খাওয়া পরার মুখাপেক্ষী করে সৃষ্টি করা হলো—এ প্রশ্নটাও এখানে উঠতে পারে। তবে তারও পর প্রশ্ন উঠে, সৃষ্টিকর্তা এই বিশ্বলোক এবং এই বিশ্বলোকে মানুষকে সৃষ্টি-ই বা করলেন কেন? সৃষ্টি করা না হলে তো এভাবে বজ্রপতনে অপঘাতে মরতে হতো না। তাহলে দেখা যায়, সৃষ্টিকর্তাই রাখালের মৃত্যুর আসল কারণ। এর পর অন্যান্য যত কারণের কথাই বলা হোক তার কোনটিই আসল কারণ নয়। এই সমস্ত কারণকে একটা শৃঙ্খলে সুবিন্যস্ত করে বজ্রপাত হওয়া সম্পর্কে চিন্তা-বিবেচনা করুন। কেননা বজ্রপাত-ই যে রাখালের মৃত্যুর বাহ্যিক কারণ, তাতে তো আর কোনই সন্দেহ নেই। তাহলে এখন দেখতে হবে, বজ্রপাত হওয়ার কারণটা কি? কেননা সে কারণটা না হলে বজ্রপাত হতো না। আর বজ্রপাত না হলে রাখালও মারা যেত না।

বজ্রপাত হওয়ার কারণটা সম্পর্কে বলা যায়, তা একটা নিতান্ত স্বাভাবিক প্রকৃতিক ও নৈসর্গিক ব্যাপার। এতে মানুষের কোন হাত নেই। এর কারণসমূহের ধারাবাহিক পর্যালোচনা এমন একটা দীর্ঘ ও জটিল ব্যাপার, যার এখানে অবতারণা করা সম্ভব নয়। মোটকথা, এ ধারাটিও শেষ পর্যন্ত বিশ্বলোক সৃষ্টি পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে। আর বিশ্বস্রষ্টাই এই বজ্রপতনের মৌল ও প্রাথমিক কারণ—একথা মেনে নেয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

আগ্নেয়াস্ত্র বিস্ফোরিত হওয়া

আর একটা দৃষ্টান্ত দেয়া যাচ্ছে। দৃষ্টান্তটি বন্দুকের গুলি ছোটার। বন্দুকের গুলী ছোটার তাৎক্ষণিক ও বাহ্যিক কারণ হচ্ছে, বন্দুকধারী ট্রিগার টানল, অমনি গুলী

ছুটল। কিন্তু তাতে যদি কার্তুস ভরা না থাকে, তাহলে ট্রিগার টানলেও বন্দুক থেকে ছুটবার কোন কারণ থাকতে পারে না। কাজেই বন্দুকের ম্যাগজিনে গুলী ভরা থাকাটাও বন্দুক ছোটার একটা কারণ হতে পারে। কিন্তু গুলী যদি ভরা থাকেও আর গুলীতে বারুদের অংশ পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকে, তা হলেও বন্দুক থেকে ছোটার কোন কারণ হতে পারে না। তাহলে গুলীতে বারুদের পর্যাপ্ত পরিমাণে শামিল থাকাটাও বন্দুক থেকে গুলী ছোটার একটা কারণ। কিন্তু বারুদ মিশিয়ে যে লোক গুলী তৈরী করেছে, বন্দুক থেকে গুলী ছোটার ব্যাপারে তার দায়িত্ব কি কম? তার মূলেও থাকে সেসব লোক, যারা বারুদের মিশ্রিত বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের বিশেষত্ব ও ক্রিয়াদি উদ্ভাবন করেছে। অবশ্য এসব লোকের দায়িত্বের পূর্বেও দায়িত্ব রয়েছে সেসব লোকের, যারা সেসব রাসায়নিক দ্রব্য মাটির গর্ভ থেকে উদ্ধার ও উত্তোলন করেছে। বন্দুক ছোটার ব্যাপারে মানবীয় দায়িত্বের চূড়ান্ত বিশ্লেষণ এখানে এসে ঠেকে যায়। এর সবগুলোই মানুষের কাজ কিন্তু এর অন্য শাখায় প্রশ্ন ওঠে, মাটির তলদেশে এসব বিস্ফোরক দ্রব্যের অবস্থিতিও তো বন্দুক থেকে গুলী ছোটার একটা কারণ। আর মাটি থেকে এই ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংমিশ্রণে গুলী তৈরী, তাই স্বয়ং মাটির অস্তিত্বও বন্দুক থেকে গুলী ছোটার কারণসমূহের মধ্যে একটি কারণ অবশ্যই বলতে হবে। আর মাটির অস্তিত্বের পিছনে রয়েছে মাটি তথা পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তার মাটি সৃষ্টি। তিনি মাটি সৃষ্টি না করলে বিস্ফোরক দ্রব্য পাওয়া যেত না। তাহলে বন্দুক থেকে গুলী ছুটতে পারত না। অতএব বিশ্বস্রষ্টাই হচ্ছেন বন্দুক থেকে গুলী ছোটার আসল ও মৌল কারণ। তিনিই তো সমস্ত জিনিস তাদের নিজস্ব বিশেষত্ব সহকারে একটা বিশেষ বিধি-বিধানের অধীন সৃষ্টি করেছেন।

উত্তপ্ত দুধে শিশুর হাত দেয়া

উত্তপ্ত ও টগ্‌বগ্‌ ফুটন্ত দুধে একটি শিশুর হাত দেয়ারও একটা দৃষ্টান্ত এখানে তোলা যেতে পারে। মা চুলার উপর দুধ গরম করছে। সে তার শিশুটিকে সেখানে বসিয়ে রেখে কোন জরুরী কাজ থাকায় অন্যত্র চলে গেছে। এ সময় শিশুটি সেই উত্তপ্ত ও টগবগ করা ফুটন্ত দুধের মধ্যে হাত চালিয়ে দিল। তাতে শিশুটির হাত জ্বলে গেল। তাহলে শিশুটির হাত জ্বলে যাওয়ার দায়িত্ব কার উপর রাখা যাবে? কে এ জন্য দায়ী? শিশু নিজে? শিশু তো নির্বোধ। তার উপর কি দায়িত্ব চাপানো যায়? তবে তার মা কি দায়ী এ জন্য? শিশুর হাত পুড়ে দিতে মার নিশ্চয়ই ইচ্ছা ছিল না, থাকতে পারে না! তাহলে মার অন্যত্র চলে যাওয়াটাই একটা কারণ। কেননা মা সেখানে উপস্থিত থাকলে তো আর শিশুটি এভাবে

উত্তপ্ত দুধে হাত দিতে পারত না। তাহলে মা কেন শিশুটিকে সেখানে রেখে অন্যত্র চলে গেল?.....হয়ত তার স্বামী শিশুর পিতা খুব তাড়াতাড়ি করে কোন কাজের জন্য তাকে ডেকেছিল। মা স্বামীর হুকুম পালনের জন্য শিশুটিকে সেখানে রেখে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। তাহলে স্বামী তাকে ডাকল কেন? সে না ডাকলে তো মা যেত না আর না গেলে শিশুর হাতও পুড়ত না। তাহলে এ হাত পোড়ার জন্য তার স্বামী—শিশুর পিতাই-দায়ী। স্ত্রী জানত, স্বামীর ডাকের সঙ্গে সঙ্গে তার নিকট উপস্থিত না হলে সে ক্রোধান্ধ হয়ে যাবে। সে তার ডাক শুনে একথা ভাববার সময় পায়নি যে, শিশুকে এখানে একাকী রেখে গেলে সে দুধে হাত দেবে ও তাতে তার হাত পুড়ে যাবে। স্বামীর মেজাজ খারাপ হওয়ার—ডাকের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে সম্মুখে উপস্থিত না পেলে ক্রোধান্ধ হয়ে পড়ার মূলেও অনেক কারণ থাকতে পারে। স্বামীর ক্রোধে স্ত্রীর ভীত বিহবল হয়ে পড়ারও অনেক কারণ রয়েছে হয়ত। হয়ত ইতিপূর্বে সে স্বামীর হাতে সেজন্য নির্যাতিতা হয়েছে অনেকবার। এভাবে চিন্তা করলে একটার পর একটা কত কারণই যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, যা আয়ত্ত করা বড়ই কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। আর শেষ পর্যন্ত সেই আসল ও প্রকৃত কারণ পর্যন্ত গিয়ে ঠেকবে।

এভাবে যত কারণই প্রকট হয়ে ওঠবে, এগুলো কি বিবেচনা যোগ্য নয়? শিশুর হাত জ্বলে যাওয়ার জন্য কে দায়ী হবে? শিশু নিজে, না তার মা কিংবা তার বাবা? অথবা সেই অসংখ্য অজ্ঞাত কারণ, না স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার উপর সে দায়িত্ব বর্তাবে?..... কে সেজন্য দায়ী? যারা কোন ঘটনার তাৎক্ষণিক ও উপস্থিত কারণকেই আসল ও প্রকৃত কারণ রূপে ধরে নেয় আর তার পূর্ববর্তী অসংখ্য অজ্ঞাত কারণকে কোন গুরুত্ব দিতে রাজী নয়, তারা শিশুর হাত জ্বলে যাওয়ার জন্য শিশুকেই দায়ী করবে। তাদের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী এ ছাড়া তারা আর কিছুই বলতেও পারে না। আর শিশুকে দায়ী বানানো হলে তাদের দৃষ্টিকোণটাই ভুল হয়ে যাবে! কিন্তু শিশু নিজেই নিজের হাত পুড়েছে এ কথা কি কোন সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মনে করে নিতে পারে? শিশুকেই তার হাত পুড়ে যাওয়ার জন্য দায়ী করা কি চরম অবিচার নয়?

প্রতিযোগিতার ফলে রক্তপাত

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রক্তপাত হওয়ার একটা দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। একটি যুবতী মেয়ে খুব মনোহর সাজে সজ্জিতা হয়ে সান্ধ্য বিহারে বের হলো। কতিপয় যুবক তাকে দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হলো। তারা প্রত্যেকেই তাকে পাওয়ার জন্য

উদ্যোগী হলো। ফলে তাদের পরস্পরে চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিল। তারা প্রত্যেকেই মেয়েটিকে অপহরণ করার জন্য নানারূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। চারদিকে ষড়যন্ত্রের একটা ব্যাপক জাল বিস্তৃত হয়ে পড়ল। এরূপ ষড়যন্ত্রের পরিণতিতে পারস্পরিক মারামারি ও রক্তপাত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। এ ঘটনার কারণসমূহ সম্পর্ক চিন্তা করুন।

সে মারামারি ও রক্তপাতের জন্য আসল দায়ী তো সেই যুবকগণ, যারা মেয়েটিকে পাওয়ার জন্য চেষ্টিত হয়েছে। সরকার যদি পূর্বে এসব বখাটে যুবকদের ধরে কঠিন শাস্তি দিয়ে দিতেন। কিন্তু এ ব্যাপারের সমস্ত দায়িত্ব নিরংকুশভাবে কি সেই যুবকদের উপরই বর্তায়? মেয়েটি যে চিত্তাকর্ষক ও পাশব বৃত্তি উত্তেজক সাজ ও উলঙ্গ অঙ্গ-সৌষ্ঠব লয়ে তাদের চোখের সামনে হাস্যে-লাস্যে বিহারে বের হলো, তার কি এ জন্য আদৌ কোন দায়িত্ব নেই? সেই কি এই কামনা ও পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টির ইন্ধন যোগায়নি? তা যদি হয়, তাহলে বলতে হবে, সেই মেয়েটিও আসলে সেজন্য দায়ী নয়। সে তো তার সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিবেশ অনুযায়ী সাজ-সজ্জা করেছে ও ঘর থেকে বাইরে বের হয়েছে। এরূপ করা তো সমাজেরই দাবি ছিল। সমাজের এরূপ দাবি না হলে বা সমাজ কর্তৃক এরূপ বের হওয়া সমর্থিত না হলে মেয়েটি এরূপ করতে নিশ্চয়ই সাহস পেত না। আর মেয়েটি বের না হলে রক্তপাতও হতো না। তাহলে সে জন্য সমাজ দায়ী। সমাজই তাকে চিত্তাকর্ষক বেশবাস নিয়ে উন্মুক্তভাবে বাইরে বের হওয়ার অনুমতি বা সুযোগ করে দিয়েছে। আর পুরুষদের যৌন লালসা চরিতার্থ করার জন্য সমাজকেই এই দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টির জন্য একটা অন্যতম কারণ বানিয়ে দিয়েছে। বেচারী মেয়ে এ রূপ না করলে তো তাকে সমাজেই পরিত্যক্তা হয়ে থাকতে হয়। সমাজই তাকে ঘৃণা করবে, কোণঠাসা করে রাখবে, তার প্রতি ঘৃণা, অপমান ও লাঞ্ছনা ঢেলে দেবে। কাজেই এরূপ রক্তপাতের জন্য কেবলমাত্র সেই যুবকরাই দায়ী নয়। দায়ী মেয়েটিও। আর আসলে এরা কেউ দায়ী নয়। দায়ী গোটা সমাজ, সমাজ বিধান, সমাজের আদর্শ ও রুচি।

আসল ব্যাপার

উপরে দেয়া এসব দৃষ্টান্তে যদি ধরে নেয়া হয় যে, বিশ্বলোক স্বতোদ্ভূত, স্বয়ম্ভু—বস্তুবাদীরা তাই মনে করে। তাহলে রাখালের মৃত্যু, বন্দুক থেকে গুলী ছোটা, শিশুর হাত জ্বলে যাওয়া এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার দরুন রক্তপাতের আসল ও

প্রাথমিক কারণ রূপে কোনটিকেই নির্দিষ্ট করা চলে না। কেননা বিশ্বলোক স্বয়ম্ভু ও চিরন্তন। তার কোন সূচনা নেই। কিন্তু এ সমস্ত ঘটনা কোন কারণ ছাড়াই সংঘটিত হয়েছে—এমন কথাই বা সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ কি করে মেনে নিতে পারে? গুলীতে বারুদ ভর্তি করা হয়েছে, গুলী বন্দুকের ম্যাগজিনে রাখা হয়েছে। বন্দুকধারী লোকটি ট্রিগারে টান দিল, তারপরই বন্দুক থেকে গুলী চলল। রাখাল পশুগুলিকে নিয়ে মাঠের দিকে বের হয়ে গেল। বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। রাখাল একটা গাছের তলায় আশ্রয় নিল বৃষ্টিতে ভেজা থেকে বাঁচবার উদ্দেশ্যে। তৎক্ষণাৎ বজ্রপাত হলো। রাখালটি মরে গেল। অর্থাৎ কতগুলি কারণ সে নিজ চোখেই দেখল, কতগুলি কারণের কথা সে নিজ কানে শুনতে পেল আর কিছু কারণ সম্পর্কে সে চিন্তা-বিবেচনাও করল। তাহলে অবশিষ্ট কতগুলি কারণ দেখল না, শুনল না ও ধারণায়ও এলো না বলেই কি তা কারণের মধ্যে গণ্য হবে না? অন্যান্য সব ঘটনা কি বিনা কারণেই ঘটে গেল?

কিন্তু বিশ্বলোকের অস্তিত্ব আল্লাহ্র হুকুমে হয়েছে—এ যদি স্বীকার করে, মেনে নেয়া যায়—মানুষের প্রকৃতি ও মানব রচিত বিজ্ঞানের ভিত্তিতেও এ কথা না মেনে গত্যন্তর নেই—তাহলে বন্দুক থেকে গুলী চলার ও অন্যান্য সব কয়টি ঘটনার মৌল কারণ যে আল্লাহ এবং তাঁরই হুকুমে সবকিছু হয়েছে ও ঘটছে, তাতে আর কোনই সন্দেহ বা কিছুমাত্র অস্পষ্টতা থাকে না। যে কোন ঘটনারই মূলে নিহিত কারণসমূহ সন্ধান ব্যাপদেশে প্রত্যেকটি সন্ধানী মানুষ শেষ পর্যন্ত এ কথা মেনে নিতে বাধ্য হবে যে, সবকিছুর প্রকৃত, আসল ও প্রাথমিক কারণ হচ্ছে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা। কারণসমূহের দীর্ঘ শিকলের মাঝখানের কয়েকটি 'কড়া'কে মেনে নিয়ে তাকেই চূড়ান্ত কারণ মনে করে বসা এবং তার উপর ভিত্তি করে ধারণা-অনুমান ও মতবাদের একটা জগত তৈরী করা অথবা সেই বাহ্যিক ও তাৎক্ষণিক কারণকে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তার পিছনের কারণগুলি সম্পর্কে চিন্তা করাকেও অর্থহীন মনে করা চরম হঠকারিতা ও প্রকৃত ব্যাপার জানবার দিকে চরম উপেক্ষা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে কয়েকটি পরম সত্য প্রকট হয়ে উঠেঃ

১. প্রথম সত্য, কোন ঘটনারই মূলে কেবলমাত্র একটি কারণই নিহিত থাকে না, কারণের বহু কড়াবিশিষ্ট একটা দীর্ঘ শিকল বর্তমান থাকে এবং তা আল্লাহ্র হুকুম পর্যন্ত গিয়ে পৌছায়—আল্লাহর হুকুমই হয় কারণ সমূহের মধ্যে মৌল ও

প্রাথমিক কারণ। এ দীর্ঘ শিকলের একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র মানুষের অনুভূতির আওতার মধ্যে আসে। আসে অনেক চিন্তা-ভাবনা বিবেচনা করার পর। অন্যথায় চিন্তা-বিবেচনা করা না হলে তো সাধারণভাবে তাৎক্ষণিক ও উপস্থিত-সম্মুখবর্তী কারণটিকেই সর্বাত্মকভাবে ঘটনার জন্য দায়ী করা হবে। কারণের শিকলের অন্যান্য অংশ মানুষের অনুভূতির আওতায় আসে না বিধায় মানুষ সেগুলিকে কারণের মধ্যে গণ্যই করে না। সেগুলিকে তারা ঘটনাবশত বা accidental মনে করে মাত্র। কুরআন মজীদে বারবার এ সত্যটি উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছে যে, দুনিয়ার সমগ্র প্রপঞ্চ-বাহ্য দৃশ্য ঘটনাবলী বা phenomenon-এ চিন্তাশীল বুদ্ধিমান লোকদের জন্য আল্লাহ্‌র পরিচিত লাভের বিরাট নিদর্শন নিহিত রয়েছে।

اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ الایتٍ لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّیْلِ وَالنَّهَارِ الایتٍ لایتٍ الاولِی الاَلْبَابْ –

২. পূর্বোদ্ধৃত আলোচনা থেকে দ্বিতীয় যে সত্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে, তা এই যে, কারণসমূহের এই দীর্ঘ 'শিকলের' প্রতিটি 'কড়া' নিজ স্থানে সীমাবদ্ধভাবে ঘটনার জন্য দায়ী। কেননা সে কারণটি যদি নিজ স্থানে বর্তমান না থাকত, তাহলে তার পরে সংঘটিত কারণ বা ঘটনাটিও সংঘটিত হতো না। সেখান থেকেই কারণসমূহের শিকলটা ছিন্ন ও শেষ হয়ে যেত, যার ধারাবাহিকতা চলতে থাকলে কঠিন হতেও কঠিনতর ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার জন্য পূর্বেই নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে।

৩. তৃতীয় সত্য এই যে, কারণসমূহের দীর্ঘ শিকলের একটা বড় অংশ মানুষ ও মানবীয় সমাজের সাথে জড়িত মনে করা যায়। মানুষের দায়িত্ব যেখান থেকে শুরু হতে দেখা যায়, মানুষ ইচ্ছা করলে সেখান থেকেই ঘটনাটিকে থামিয়ে দিতে পারে। কেননা মানুষ তো ইচ্ছা ও স্বাধীনতাসম্পন্ন জীব। আল্লাহ তা'আলা তাকে এতটা ইচ্ছা-ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দিয়েছেন যে, প্রতিটি ঘটনার সংঘটিত হওয়ার মূলে যতগুলি কারণ তার সাথে সংশ্লিষ্ট, মানুষ ইচ্ছা করলে সেই কারণসমূহ আদপেই অনুষ্ঠিত হওয়ার পথ বন্ধ করে দিতে পারে। কারণই যদি না হয়, তাহলে কর্ম হবে কি করে? কিন্তু কর্ম বা ঘটনা সংঘটিত হয় শুধু এ কারণে যে, মানুষ তা হৃদয়াবেগ, তাৎক্ষণিক প্রয়োজন ও দৃশ্যমান স্বার্থ-সুযোগ দেখে—না নিজের বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে নিজেকে সংযত করতে পারে, না

অন্যান্য ন্যায়বাদী চিন্তাশীল লোকদের কথাবার্তা শুনে তার উপর দৃঢ় প্রত্যয় স্থাপন করে তাদের দেখানো পথে চলতে প্রস্তুত হয়ে থাকে। একটি পরিবেশে বিপর্যয় সৃষ্টির যতগুলি কারণ মানুষের সঙ্গে জড়িত বা সম্পর্কশীল, সেসব কারণ সৃষ্টির পথ বন্ধ করে দিতে পারে সেই সব লোক, যারা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, প্রকৃত ও নিগূঢ় ব্যাপার সম্পর্কে যারা অবহিত, যারা আবেগ-উচ্ছ্বাসকে সংযত রাখতে সক্ষম আর যারা দৃঢ় ইচ্ছা ও সংকল্পসম্পন্ন এবং সর্বপ্রকারের আকর্ষণ-উত্তেজনা, বিপদের মুকাবিলা করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। কিন্তু এইরূপ গুণের অধিকারী লোকদের সংখ্যা সমাজে খুব কমই হয়ে থাকে। তাসত্ত্বেও এই গুণের লোকেরা নিজেদের পবিত্র নৈতিকতা ও চরিত্র বলে এবং আদর্শ প্রচার ও মানস গঠনমূলক কার্যক্রমের ফলে বিপর্যয়সমূহকে স্বাধীন অবাধে ছড়িয়ে পড়া থেকে রুখতে সক্ষম হয়। কিন্তু সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব যদি স্বার্থবাদী ও চরিত্রহীন লোকদের হাতে নিবদ্ধ থাকে, তাহলে বিপর্যর সৃষ্টিকারী কারণসমূহ পূর্ণ স্বাধীনতার সাথেই তাদের ইচ্ছামত কাজ করতে থাকে।

এসব কথা নিয়ে একটু চিন্তা-বিবেচনা করলেই জানতে পারা যায় যে, আল্লাহ্‌র কালামের বহু কয়টি আয়াতে এই সত্যই সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ায় যা কিছু ঘটে, তা আল্লাহ্‌র হুকুমেই সংঘটিত হয়। কিন্তু মানুষ তার সংক্ষিপ্ত ও সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে যা কিছু করে তার জন্য সে-ই দায়ী। এই কারণে সে পরকালে শাস্তি বা পুরস্কারের অধিকারী হবে।

হঠাৎ ঘটে যাওয়া ব্যাপার, না আল্লাহ্‌র হুকুম

মনে করা হয় যে, প্রত্যেক প্রপঞ্চ এবং মানুষের প্রত্যেক চিন্তা ও কাজ তার পরে সংঘটিতব্য প্রপঞ্চ এবং চিন্তা ও কাজের কারণ। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, তার একটা প্রথম সংঘটিত হয়েছে এবং দ্বিতীয়টি তার পরে। এইজন্য একটিকে 'কারণ' বলা হচ্ছে আর অন্যটিকে উহার ফল। একটি লোক যখন স্বীয় ইচ্ছায় ও বাসনাক্রমে কোন কাজ করে এবং তার ফল হিসেবে কোন ঘটনা সংঘটিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা ও কাজকেই সেই ঘটনার আসল কারণ মনে করে। অথচ তার ইচ্ছা ও কাজ অসাধারণভাবে জটিল কারণ-ধারাবাহিকতার একটা 'ফল' হয়ে থাকে। একটি কারণ ও তার ফলে যদি দীর্ঘ অবকাশ বা সময়ের বড় ব্যবধান থেকে যায়, তাহলে এই কারণের গুরুত্ব অধিক বাড়িয়ে দেয়া হয়। তখন কারণ-ধারাবাহিকতার প্রতি কোন লক্ষ্যই আরোপিত হয় না।

ভূ-স্তরের সৃষ্টিগত ও গঠনগত পর্যায়সমূহ সম্পর্কে চিন্তা করলে এ সবের

কারণ ও ফল-এ অসাধারণ ফাঁক ও অবকাশ লক্ষ্য করা যায়। এখানে কতিপয় বস্তুগত কারণ তো পর পর লক্ষ্য করা যাবে; কিন্তু কারণের এই ধারাবাহিকতা এক স্থানে এসে শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর যেসব কারণ রয়েছে, তা বস্তুগত কারণ নয়, তা সম্পূর্ণ অবস্তুগত। অর্থাৎ তা এমন সব কারণ, যা আমাদের বিবেক-বুদ্ধি অনুভব করতে সমর্থ নয়। এই কারণেই বস্তুবাদীরা বস্তুগত কারণের ধারাবাহিকতা যেখানে শেষ হয়ে যেতে দেখে, তার পরবর্তী কারণসমূহ অনুধাবন করতে তাদের বিবেক-বুদ্ধি অক্ষম হয়ে যায়। তারা বিষয়টির ব্যাখ্যাদানে সামনের দিকে আর অগ্রসর হয় না। বরং তারা একথা বলে বক্তব্য শেষ করে দেয় যে, এর পরবর্তী সব ঘটনা নিতান্তই ঘটনাবশত বা accidentally ঘটে গেছে। বিজ্ঞানের দফতর থেকে এ ধরনের অনেক দৃষ্টান্তই দেয়া যেতে পারে। এখানে মাত্র দুটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

প্রথম দৃষ্টান্ত ঃ মানুষের অস্তিত্ব কি ভাবে হলো, এ বিষয়ে অধিকাংশ জীব-বিজ্ঞানীই একমত যে, মানুষ কোন স্বতন্ত্র সত্তা কিছু নয়, জীববিজ্ঞানের পরিভাষা অনুযায়ী Protoplasm নিজেই নিজেকে কতিপয় প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক প্রভাবের অধীন এক কোষ (cell) সম্পন্ন হলো এবং এই এক কোষসম্পন্ন মৌল উপাদানই দুনিয়ার সমস্ত জীবসত্তা—উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব লাভের কারণ। এই এক কোষ স্বীয় পরিবেশের স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক কার্যকারণের কর্মতৎপরতর দরুন ক্রমবিকাশমান বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে করে বহু কোষসম্পন্ন জটিলতার উদ্ভিদ ও জন্তু-জানোয়ার জন্ম দিয়েছে। এইভাবে এদের কোটি কোটি প্রকারের সত্তা অস্তিত্ব লাভ করতে থাকল। শেষ পর্যন্ত ক্রমবিকাশ পর্যায়সমূহের সর্বশেষ ও সর্বাধিক জটিল জীব অস্তিত্ব লাভ করল। আর সে-ই হলো মানুষ। এই এক কোষ বিশিষ্ট মৌল সত্তা কি করে মানুষকে জন্ম দিল, বিভিন্নভাবে তার ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে। কিন্তু স্বয়ং 'প্রোটোপ্লাজম' কি করে অস্তিত্ব লাভ করল, সে বিষয়ে বলা হয় যে, তা বহু অজ্ঞাত কারণের দরুন প্রথমে পানির মধ্যে দানা বেঁধে উঠেছিল।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ঃ বিশ্বলোক সৃষ্টি সম্পর্কে যে সব ব্যাখ্যা দেয়া হয়, তা প্রোটোপ্লাজমের ন্যায় কতিপয় মৌল উপাদানের আকস্মিক ও ঘটনাবশত অস্তিত্ব লাভের পর থেকে শুরু করা হয়। ১৭৪৫ সনে একজন ফরাসী নাস্তিক বিশ্বলোক সৃষ্টি সম্পর্কে নিজের ধারণা পেশ করে বলেছিল যে, সূর্যের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সৌর বস্তু অণুসমূহ থেকেই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ অস্তিত্ব লাভ করেছে। তার মতে বিশ্বলোক আল্লাহ্‌র সৃষ্ট নয়; বরং তা হচ্ছে বস্তুগত ও স্বভাবগত

ক্রমবিকাশের ফল। ১৭৯৬ সনে অপর একজন ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলল, প্রাথমিক অবস্থায় সূর্যের চারপার্শ্বে এক ধরনের উত্তপ্ত ও হালকা বায়ুমণ্ডল ছিল। তা থেকেই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ অস্তিত্ব লাভ করেছে। মিঃ জীন্‌স (Jeans) নামক জনৈক বৃটিশ জ্যোতির্বিদ এই শতকের শুরুতে এ পর্যায়ে আর একটি ধারণা পেশ করেছে। তার মতে পৃথিবী ও গ্রহ-উপগ্রহসমূহ যে বস্তু থেকে তৈরী, তা একটা বড় আকারের নক্ষত্রের সূর্যের নিকট থেকে অতিক্রম করার কারণে সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছিল।

বস্তুত বিশ্বলোক সৃষ্টি সম্পর্কে যতগুলি মত আজ পর্যন্ত পেশ করা হয়েছে, সেই সবগুলো এ দিক দিয়ে সম্পূর্ণ অভিন্ন যে, সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বস্তু থেকেই পৃথিবী ও গ্রহ-উপগ্রহের অস্তিত্ব সম্ভবপর হয়েছে। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এসবের সারকথা হলো—বিশ্বলোকের অস্তিত্ব লাভের পূর্বে সূর্য বর্তমান ছিল, কিন্তু স্বয়ং সূর্যটির অস্তিত্ব কি করে সম্ভবপর হলো, তার কোন ব্যাখ্যাই তারা কেউই দিতে পারে না।

রাশিয়ান জ্যোতির্বিদরা এ ব্যাপারে একমত যে, সূর্যের চারপার্শ্বে গ্যাস ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুর মেঘপুঞ্জ আবর্তিত হচ্ছিল। এই মেঘপুঞ্জ থেকেই বিভিন্ন গ্রহের অস্তিত্ব সম্ভবপর হয়েছে। সৌরলোক ক্রমবিকাশের স্তর ও পর্যায়সমূহ অতিক্রম করে বর্তমান রূপ ও আকার-আকৃতি লাভ করেছে। এ ব্যাপারে দুটি জিনিসের অস্তিত্ব মেনে নেয়ার পর সৌরলোক সৃষ্টির ব্যাপারে খুব বেশী মাথা ঘামানো হয়েছে এবং খুব দীর্ঘ আলোচনা পেশ করা হয়েছে। কিন্তু এ দুটি জিনিস—অর্থাৎ সূর্য ও তার চতুস্পার্শ্বে আবর্তনশীল গ্যাস ও অণুর মেঘপুঞ্জ কি করে অস্তিত্ব লাভ করল, তা কোত্থেকে কেমন করে এল, বিজ্ঞান এ সম্পর্কে একেবারে নির্বাক, লা-জওয়াব। জার্মান দার্শনিক কান্ট (Kant) ১৭৫৫ সনে লিখেছিলেন : "আমাকে বস্তু সংগ্রহ করে দাও, আমি দেখিয়ে দেব যে, বস্তু থেকে দুনিয়া কি করে বানানো যেতে পরে।" কান্টের এই কথা থেকে নাস্তিক ও জড়বাদীরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, সৌরলোকের বিকাশ ও অস্তিত্বের জন্য কোন অতিপ্রাকৃতিক শক্তির হস্তক্ষেপের কোন প্রয়োজন হয়নি।

কিন্তু যে বিজ্ঞানীরা অগ্রসর হয়ে সৌরলোকের অস্তিত্ব ও বিকাশের মূলে নিহিত 'বস্তু' বা 'জড়' সম্পর্কে চিন্তা করেছেন, তাঁরা এ সব কিছুই একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি বলে মেনে নিতে একান্তভাবে বাধ্য হয়েছেন। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ১৯৫১ সনে The Origin of the Earth নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। তাতে লেখা রয়েছে :

To many of us, scientific and non, scientific alike, the belief in a divine Creator is as necessary now as ever it was.

‘বিজ্ঞানী হই কি অ-বিজ্ঞানী, আমাদের অনেকের নিকটই একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আল্লাহ্‌র সৃজনশীলতার (বা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকর্তা হওয়ার) প্রতি ঈমান গ্রহণ বর্তমানেও ঠিক ততটাই জরুরী, যতটা জরুরী তা সর্বকালে।

কিন্তু বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যবাদে যাদের বিশ্বাস দৃঢ়মূল ও তার বিপরীত কথার প্রতি যারা চরম বিদ্বেষভাবাপন্ন, তারা আল্লাহ্‌কে সৃষ্টিকর্তারূপে মেনে নেয়ার কথা শুনতেও প্রস্তত নয়, সে বিষয়ে চিন্তা-বিবেচনা করা তো দূরের কথা। কিন্তু তাদের ক্রমবিকাশ তত্ত্বেও সাহায্যে প্রপঞ্চের যে ব্যাখ্যাই দেয়া হয়েছে, তা আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণতা ও পরিপূর্ণতা লাভ করেনি। এ ব্যাখ্যার একটি পর্যায় এমন এসেছে যখন তারা কথা বলতে বাধ্য হয়েছে যে, এর পরবর্তী পর্যায়ের ব্যাপারটি মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধির অগম্য।[১]

উপরোক্ত গ্রন্থের বিজ্ঞান বিশারদদের এই স্বীকারোক্তি উদ্ধৃত হয়েছে যে, বিশ্বলোক সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ্‌র একক কর্তৃত্ব ও নিরংকুশ শক্তির আমোঘ হস্তক্ষেপের কথা বিশ্বাস না করে ও তার প্রতি ঈমান না এনে কোনই উপায় নেই। বর্তমানে প্রকৃতির সুবিপুল গোপন তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয়েছে, তাতে প্রপঞ্চের বস্তুগত ব্যাখ্যাদানের পথ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী উন্মুক্ত ও বাধা-বন্ধনহীন হওয়া উচিত ছিল, বস্তুগত মতাদর্শ ও চিন্তা-পদ্ধতির প্রতি বিশ্বাস পূর্বাপেক্ষাও অনেক বেশী দৃঢ় ও অবিচল হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। আর তার পরিণামে আল্লাহ্‌র সৃজনশীলতার প্রতি ‘অন্ধ বিশ্বাস’ থাকলেও তা ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়াই ছিল তার অনিবার্য ফল।

কিন্তু বাস্তবে ঘটেছে সম্পূর্ণ ভিন্নতর অবস্থা। প্রকৃতির গোপন রহস্য যতই উদ্ঘাটিত হয়ে আসছে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকর্তা হওয়ার প্রতি ঈমান ততই অপরিহার্য হয়ে উঠছে। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বিশ্বপ্রকৃতির নিগূঢ় রহস্য যতই উদ্ঘাটিত হবে, বিশ্বলোক-স্রষ্টার অনন্যসাধারণ কুদরত প্রতিপালন, কর্ম-কুশলতা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা দক্ষতার প্রতি মানুষের ঈমান ততই সুস্পষ্ট দৃঢ় ও অবিচল হয়ে গড়ে উঠবে। আর এ-ই হচ্ছে মানব-প্রকৃতি নিহিত একটি পার্থক্যহীন বিশেষত্ব। ঠিক এজন্যই আল্লাহ্‌র কালাম কুরআন মজীদে বার বার বিশ্ব ব্যবস্থার নিগূঢ় তত্ত্ব

১. ক্রমবিকাশ তত্ত্ব সম্পর্কে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে—গ্রন্থকার।

রহস্য সম্পর্কে সূক্ষ্ম গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। তবে যারা অকারণ অন্ধ বিদ্বেষে নিমজ্জিত, যাদের সম্পর্কে কুরআন বলেছে যে, "তাদের মন-মগজের উপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে," তাদের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তারা হয়ত কোন দিনই বুঝবে না, বুঝতে প্রস্তুতই হবে না, অথবা বুঝেও সত্যকে স্বীকার করবে না। তাদের ছাড়া অন্যান্য বহু নাস্তিক বস্তুবাদী লোক বিজ্ঞানের গভীর সূক্ষ্ম তত্ত্ব জানতে পেরে বস্তুবাদ, জড়বাদ ও নাস্তিকতাকে পদাঘাত করে এক আল্লাহ তা'আলাকে মহান সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা রূপে মেনে নিয়েছে এবং এরই ভিত্তিতে তারা চালিয়েছে তাদের চিন্তা ও গবেষণা এ পর্যন্তকার আলোচনা থেকে এটুকু কথা তো সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বিশ্বলোকের যে কোন অংশ বা গোটা বিশ্বলোকের অস্তিত্ব ও বাস্তবতার যে ব্যাখ্যাই করা হোক এবং তার ভিত্তিতে এ সম্পর্কে যে-ধারণা প্রকল্প বা মতাদর্শই গড়ে তোলা হোক, তা কোন-না-কোন পর্যায়ে অনিবার্যরূপে ব্যর্থ হয়ে যাবে। যে পর্যায়েই মতবাদ কোন পথ দেখাতে পারে না, সম্মুখবর্তী সমস্যার কোন সমাধান দিতে পারে না এবং উত্থিত প্রশ্নের কোন জবাব দেয়াই সম্ভবপর হয় না, তখনই বস্তুবাদীরা তাকে একটা 'হঠাৎ' ও 'বিনা কারণে' বা accidentally ঘটে যাওয়া ব্যাপার বলে গোজামিল দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তা বলে তারা নিজেরাও মনে কোন সান্তনা পায় না, অন্য কাউকেও পারে না শান্ত বা convinced করতে। অবশ্য আল্লাহ্ বিশ্বাসী মানুষ এখানে দৃঢ়বিশ্বাস সহকারে বলে যে, এটা আল্লাহ্র ফায়সালা—আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া আর কিছুই নয়।

কার্যকারণ ধারাবাহিকতায় মানুষের স্থান

প্রপঞ্চ (phenomenon) এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পর্যায়ে এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে, তা থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কারণ-ধারাবাহিকতায় মানুষের কাজ বিশ্বলোকে নিহিত কারণ-'কড়া'র মত এটা 'কড়া' নয়। বিশ্বলোকের অপরাপর অংশ কারণ-শিকলে (series of causes) যেসব কড়া রচনা করে, তা বানায় প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর অধীনে থেকে। প্রাকৃতিক নিয়মাবলী ভিন্ন সেসবের উপর অন্য কোন কারণ বা factor কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এ কারণে 'কারণ-শিকলের' ধারায় সেরূপ জটিলতা কখনও দেখা দেয় না, যা মানুষের কাজের দরুন সৃষ্ট অংশে দেখা দেয়। এই কারণে মানুষের কাজ ও কর্মপদ্ধতির বিশ্লেষণ না করা হলে তার কারণ বা factor সমূহের (যার দরুন মানুষ কাজ করে) খোঁজ না লাগানো হবে, কার্যকারণ সম্পর্কিত আলোচনা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। আর তার দরুন এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে আমরা কোন শিক্ষা-ই লাভ করতে পারব না।

মানুষ ইচ্ছা-প্রয়োগের অধিকারী

দুনিয়ার ইতিহাস সাক্ষী, প্রত্যেক যুগে ও কালে একই ধরনের বহু ঘটনা ও প্রপঞ্চ শেষহীন কার্যকারণের অধীন সংঘটিত হয়ে থাকে। বরাবর এমনি ঘটে আসছে। এ যখন সত্য তখন এ-ও অনস্বীকার্য যে, শেষ দিন পর্যন্ত এমনিই হতে থাকবে। কারণ শিকলের যে অংশ মানুষ ও মানব-সমাজের সাথে সম্পর্কিত তা মানুষের ইচ্ছা ও মানসিকতার অধীন। সেখানে মানুষ যা-ইচ্ছা করতে পারে। সমাজ ইচ্ছা করলে সেখান থেকেই তার দিক পরিবর্তন করে সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে চালিয়ে দিতে পারে। সেখান থেকে এই ধারাবাহিকতা সামাজিক বিপর্যয় বা পাপের দিকে মোড় নিতে পারে বলে মনে হবে, মানুষ ও সমাজ ইচ্ছা করলে সে ধারাবাহিকতাকে বিপর্যয় ও পাপের দিক থেকে ঘুরিয়ে শান্তি সুবিচার ও ন্যায়পরতার দিকে চালিয়ে দিতে সক্ষম। সেখানে মানুষ এমন কিছু কারণ জুড়ে দিতে পারে, যা বিপর্যয়ের পরিবর্তে শান্তি ও নিরাপত্তার স্থাপক হবে। অবশ্য কারণ-ধারাবাহিকতার দিক পরিবর্তন করে দেয়া কোন এক ব্যক্তির কর্ম নয়, নয়

তা নিছক ব্যক্তিগত কাজ। তা হচ্ছে গোটা সমাজের সামষ্টিক কাজ। ব্যক্তিগতভাবে একজন মানুষ শুধু এইটুকুই করতে পারে যে, কোন বিপর্যয় হতে দেখতে পেলে তার কারণসমূহকে জানতে চেষ্টা করবে, তন্মধ্যে কোন কারণকে যদি স্বীয় ইচ্ছা ও সংকল্পের ভিত্তিতে বন্ধ করতে পারে, তাহলে তা অবশ্যই বন্ধ করে দেবে। উপরন্তু নিজে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কোন একটি কারণ হয়ে দাঁড়াবে না, কোন কারণ নিজেও সৃষ্টি করবে না। কিন্তু প্রশ্ন এই যে একটি কাজ সংঘটিত হলে তা এমন সকল কারণ সৃষ্টির জন্য দায়ী হবে, যা অসংখ্য অননুভূত বিপর্যয় সৃষ্টি করে করে একটা বড় ও ভয়াবহ বিপর্যয়কারী ঘটনায় পরিণত হবে—একথা মানুষ আগে ভাগে কেমন করে বুঝতে বা অনুভব করতে পারে?

এর জবাবে বলা যায়, মানুষের তিনটি দিক, তিনটি অবস্থা ঃ

১. মানুষ বহু কাজ নিছক স্বাদ-আস্বাদন ও মজা লুটবার উদ্দেশ্যে করে থাকে। কিন্তু তার এই কাজ সমাজকে বিপর্যয়ের দিকে টেনে নেয়ার কত অসংখ্য কারণ সৃষ্টি করে, সে বিষয়ে সে এক বিন্দু ভাবে না, ভাববার প্রয়োজন মনে করে না। মজার নেশায় তা ভাববার যোগ্যতাও থাকে না বোধ হয় তার।

২. সমাজে কত শত কাজ করা হয় শুধু উপস্থিত ও ক্ষণিক-সাময়িক ফায়দা লাভের উদ্দেশ্যে। যেসব কাজের উপস্থিত ফল সুখময় ও মোহ সৃষ্টিকারী মনে হয়, তার দূরবর্তী অনিবার্য ফল যতই মারাত্মক ও ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হোক, তা গোটা সমাজকে নিজের দিকে আকৃষ্ট ও সেজন্য বিপুলভাবে উদ্বুদ্ধ করে নেয়। অবশ্য সমাজের চিন্তাশীল বুদ্ধিমান ও আদর্শবাদী লোকেরা কখনও উচ্ছ্বাস স্রোতের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয় না।

৩. কাজসমূহের তৃতীয় দিক হলো সেসবের বহু দূরে-অবস্থিত ফল, তা কেবল চিন্তাশীল লোকেরাই দেখতে পায়। স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা তা কখনই দেখতে পায় না। কাজসমূহের কতগুলির ফলাফল এত দূরে থাকে, এত বিলম্বে প্রকাশ পায় যে, বড় বড় চিন্তাশীল ও দূরদর্শী লোকদের দৃষ্টিও সে পর্যন্ত পৌঁছায় না। এজন্য তারা সেসব কাজ সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই কোন মন্তব্য রাখতে সক্ষম হয় না। কিন্তু কেউ বুঝতে পারুক আর নাই পারুক ফলাফল যা হবার যথাসময় তা অবশ্যই প্রকাশ পাবে, তা কেউ রোধ করতে পারে না।

মানুষ যদি জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক ও ইচ্ছাসম্পন্ন না হতো, অন্যান্য সৃষ্টির মত নিছক জৈবিক প্রকৃতিগত ও স্বভাবগত সজ্ঞা ও স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির ভিত্তিতেই যদি মানুষ সব কাজ করত, তাহলে কাজগুলির কেবল একটি মাত্র দিকই হতো।

আর তার জৈবিক স্বভাবগত প্রেরণা তার দ্বারা কেবল সেসব কাজ-ই করাত, যা তার স্বভাবগত অনুভূতি ও স্বজ্ঞাকেই চরিতার্থ করতে পারে। আর কাজগুলির এই তিনটি দিকেরই কারণে কার্যকারণ ধারাবাহিকতায় যে জটিলতা দেখা দিয়ে থাকে, তা কক্ষণই দেখা দিত না।

মানুষ ইচ্ছা-ক্ষমতাসম্পন্ন বিধায় স্বভাবগত প্রবণতা ও তাকীদ ছাড়া আরও তিনটি প্রেরণাদাতার নির্দেশে মানুষ কাজে উদ্বুদ্ধ হয়। সে তিনটি হলো ঃ

১. মনের কামনা-বাসনা-লালসা; ২. খুব তাড়াতাড়ি ফল পাওয়ার প্রবণতা; এবং ৩. দৃঢ় ইচ্ছা ও সংকল্প।

১. যে কাজ করলে আনন্দ স্ফূর্তি ও স্বাদ-মজা লাভ সম্ভব, মানুষের মনের লালসা তাকে সে কাজ করার জন্য আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করে। কুরআনের ভাষায় তাই হলো নফ্‌সে আম্মারা। তা মানুষকে মজাদার এবং নিতান্তই মন্দ কাজের দিকে টেনে নেয় সতত। এর মধ্যে এমন বহু কাজ-ই মানুষ করে থাকে, যার বিশেষত্ব হলো—তা করা হলে কারণ ধারাবাহিকতাকে বিপর্যয়ের দিকে ঘুরিয়ে নেবে। আর কোন এক সময়-খুব শীঘ্র কিংবা বিলম্বে তা কঠিন বিপর্যয়ে পরিণত হবে। দুনিয়ায় প্রায়ই এরূপ হতে দেখা যায়। ঠিক সেই কারণেই এখানে নানা প্রকারের বিপর্যয় সংঘটিত হতে থাকে। কিন্তু সেসব বিপর্যয়ের মৌল ও প্রকৃত কারণ কি, তা লোকেরা সাধারণত বুঝতে পারে না। যেসব লোকের উপর তাদের নফ্‌সে আম্মারা বিজয়ী অর্থাৎ যে সব লোক নফ্‌সে আম্মারার দাসানুদাস, তারাই যদি সমাজের উপর কর্তৃত্ব লাভ করে এবং তারাই ক্ষণস্থায়ীভাবে হলেও সমাজের ভাগ্য-বিধাতা—নিয়ন্ত্রক-পরিচালক—হয়ে বসে, তাহলে সমগ্র সমাজের গতি নিশ্চিত ধ্বংস ও বিপর্যয় বিলুপ্তির দিকে ঘুরে যাবে। সমাজের ভাল লোকেরা অর্থাৎ যারা 'নফসে আম্মারা'র দাসত্ব কবুল করেনি, লালসার দাস হতে প্রস্তুত হয়নি, বরং বিবেক-বুদ্ধি ও নির্ভুল জ্ঞানের দরুন 'নফসে আম্মারা'র বিপর্যয়কারী প্রবণতা সুস্পষ্ট বুঝতে পেরেছে এবং বুঝতে পেরেই তাকে দমন করে রাখতে চেষ্টা করেছে, তারা দৃঢ় ইচ্ছা ও সংকল্প থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে ঘরের কোণায় নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকে। ফলে দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা সমাজের ব্যাপক বিপর্যয়কারী কর্মকাণ্ড ঘটাবার এবং ধ্বংস ও প্রলয় সৃষ্টি করার অবাধ সুযোগ লাভ করে থাকে।

২. মানুষ যদি নিজের মনের লোভ-লালসা দুষ্প্রবৃত্তির কিছুটা আয়ত্তাধীন ও নিয়ন্ত্রিত করে রাখতে সক্ষম হয়ও, তবু মানব-প্রকৃতি নিহিত 'নগদ পাওয়ার

প্রেরণা ও খাহেশ সেই কাজের দিকেই তাকে উদ্বুদ্ধ করে, যার নগদ ও উপস্থিত কিছু -না-কিছু ফায়দা লক্ষ্য করা যায়। যেসব কাজের নগদ ফায়দা কিংবা নগদ ক্ষতি রয়েছে, সে সবের দূরবর্তী ফল সম্পূর্ণ ভিন্নতর হয়ে থাকে। কিন্তু কাজের শুরুতে সে ফলের কোন পূর্বাভাষই পাওয়া যায় না যেমন, তেমনই স্থুলদর্শী লোকদের দৃষ্টি ততটা গভীরে পৌছায় না। তাই সেসব ফল সম্ভাব্য হওয়া সত্ত্বেও সেই কাজ করতে শুরু করে দেয়া হয়। দেশে দেশে সুদী কারবার চলার ব্যাপারটি এ পর্যায়ের একটা দৃষ্টান্ত। সুদী কারবারের লাভ সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত। কিছু পরিমাণ টাকা বিনিয়োগ করে কোনরূপ শ্রম বা ঝুঁকি ছাড়াই নিয়মিত ও স্থায়ীভাবে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ হাতে আসতে থাকে। এটা বড় লোভনীয়। এতে দুর্বার আকর্ষণ নিহিত। কিন্তু এর ফলে জনসমাজে যে ব্যাপক ও মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেয়, ধ্বংসের যেসব 'কারণ' কচ্ছপের ডিমের মত জন্ম হতে থাকে, সে দিকে বহু লেখা-পড়া জানা ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরও দৃষ্টি পড়ে না, বুদ্ধিমান লোকেরা তা বুঝেও বুঝতে চায় না। বরং এর মারাত্মকতা সম্পর্কে একবিন্দু চিন্তা-ভাবনা করাকেও নিষ্ফল ও অর্থহীন মনে করে। অথচ একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিবেচনা করলেই এর মারাত্মক রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। আধুনিক অর্থনীতির বিচার বিশ্লেষণও একথা একাট্যভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, সমাজের লোকদের মধ্যে শ্রেণী-বৈষম্য ও বিভেদ-বিদ্বেষ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শত্রুতা, ঘৃণা ও পরিণামে শ্রেণী-সংগ্রাম সৃষ্টির মৌল কারণই হচ্ছে এই সূদী কারবার। এ ছাড়া সুদী কারবারের ফলে সমাজে যে নৈতিক দোষ-ত্রুটি ও বিপর্যয় দেখা দেয়, তার কোন হিসেব-নিকেশ করা সম্ভব নয়। অথচ মানুষ 'নগদ পাওয়ার' প্রকৃতিগত প্রেরণায় বাধ্য হয়ে তার উপস্থিত ও বাহ্যিক ফায়দার লোভে লালায়িত হয়ে এই সুদী কারবারেই ব্যাপক ও গভীরভাবে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে। তার অনিবার্য পরিণতির মারাত্মক বিপর্যয় তারা দেখতেই পায় না কিংবা দেখেও দেখে না।

গ্রহণ ও বর্জনের এসব প্রেরণা লোভ-লালসা, স্বাদ-আস্বাদনপ্রিয়তা ও উপস্থিত বাহ্যিক ফায়দা লাভের অদম্য উন্মাদনার কারণে মানব মনে সৃষ্ট হয়। আর এ প্রেরণাই সমাজ তথা মানবতার ধ্বংস ও বিপর্যয়ের একমাত্র কারণ। এসব প্রেরণা যতদিন স্বাধীনভাবে জাগতে ও কাজ করতে থাকবে, ততদিন প্রকৃত কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ করা সমাজের পক্ষে সম্ভবপর হবে না। সমাজের উত্তম চরিত্রবান ও সুস্থ শুদ্ধ চিন্তাশীল লোকেরা সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গলের ব্যবস্থাপক কার্যসূচী গ্রহণ করতে সব সময়ই সচেষ্ট থাকে। তারা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি ও যোগ্যতা সামর্থ্য অনুযায়ী নানা প্রকারের মতাদর্শ ও কার্যসূচী সমাজ সমক্ষে পেশ করে।

সমাজে তার প্রচারও হয়। ঘটনাবশত এ শ্রেণীর লোকদের হাতে যদি রাষ্ট্রক্ষমতা এসে যায়, তাহলে তারা বল ও শক্তি প্রয়োগ করে সেসব প্লান-কার্যকর করেও তোলে। কিন্তু কালের ইতিহাস একথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, যেখানে উক্তরূপ অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম প্লান-প্রোগ্রাম কার্যকর হয়, সেখানেই নতুন নতুন এমন সব 'কারণ' অবশ্যই দেখা দেয়, যা মানবতা ও মনুষ্যত্বকে চরম পর্যায়ের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার গভীরতর পংকে নিমজ্জিত করে দেয়। কেননা কৃত্রিম ও স্বভাব-পরিপন্থী প্লান-প্রোগ্রাম কখনই কল্যাণের ব্যবস্থাপক পথ উন্মুক্ত করতে পারে না। বস্তুত মানব কল্যাণের পথই মানুষের ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ও উৎকর্ষ দানে সক্ষম। এই পথে চললেই প্রকৃতি, বিবেক-বুদ্ধি, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক—এ চারটি দিক দিয়েই মানুষের সত্যিকার উৎকর্ষ ও বিকাশ লাভ সম্ভবপর। মানব কল্যাণের পথ এমন একটা জীবন যাপন পদ্ধতি, যা গ্রহণ ও অবলম্বন করে মানুষ কেবল বস্তুগত, বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করতেই সক্ষম হয় না, বুঝসমঝ, পারস্পরিক লেন-দেন ও কাজ-কর্ম, নৈতিকতা ও চরিত্র—সর্বোপরি মন-মানসিকতা ও আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণতার পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়ার কারণসমূহ ক্রমাগতভাবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। ফলে গোটা সমাজই স্বাভাবিক পরিবেশ সহকারে মানবীয় ব্যক্তিত্বের পূর্ণত্ব সাধনে আত্মনিয়োগ করে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষের বিবেক বুদ্ধি কি এই পথটি রচনা বা নির্ধারণ করতে সক্ষম? না, স্বয়ং মানুষের বিবেক-বুদ্ধি বলে দেয় যে, তার পক্ষে এ কাজ সম্পূর্ণ অসাধ্য। মানুষের বিবেক-বুদ্ধি বৈষয়িক ও বস্তুগত উৎকর্ষ উন্নতির পথ ও পন্থা আবিষ্কার করতে পারে, তা নিঃসন্দেহ। কোন্ কোন্ কারণে মানবতার উন্নতি-উৎকর্ষ এবং ধ্বংস ও বিপর্যয় ঘটে এবং সে দিকে নিয়ে যায়, কোন্ সব কারণে ফলে তা সম্ভব হয় এবং তার অপর কোন্ কোন্ 'কারণ' সৃষ্টি করে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি তার সন্ধান করতে আদৌ সক্ষম নয়। এ পর্যন্তকার বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে এই কথা অকাট্যভাবে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মানব-কল্যাণের কারণ ও প্রেরণাদায়ক

মানুষ যে সত্তার নিকট থেকে কল্যাণ পাওয়ার আশা করে এবং যে সত্তা মানুষের ক্ষতি করতে পারে বলে বিশ্বাস করে, সে সত্তা যদি মানুষের দৃষ্টিতে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতার অধিকারী হয়, তাহলে সে সত্তার প্রতি মানব মনে জাগে অনুগৃহীত হওয়ার হৃদয়-ভরা উচ্ছ্বাস ও ভক্তি-শ্রদ্ধামূলক ভাবধারা। এই ভাবধারাই মানুষকে সেই সত্তার সম্মুখে অপরিসীম ভক্তি-শ্রদ্ধা-বিনয় ভরা মস্তক অবনত করতে বাধ্য করে। এই সত্তা যাতে সন্তুষ্ট, সে-ও তাতেই সন্তুষ্ট হয় এবং

যেখানে এ সত্তার রোষ-আক্রোশ সে-ও তাতেই রুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয়। সে সত্তার অসন্তোষকে সে তার মন-প্রাণ ও প্রতিটি লোমকূপ দিয়ে ভয় করে, সমীহ করে চলে। যে কাজে সে সত্তার রোষ অসন্তোষ, সে কাজ করতে সে কখনই এবং কোন ক্রমেই রাজী হয় না। সে সত্তাই হয় তার সর্বাধিক প্রিয়। যতদিন ব্যক্তির আশা-আকাঙক্ষার বিপরীত কিছু, সে সত্তা সম্পর্কে সে জানতে পারে না, ততদিন পর্যন্ত সে সেই সত্তার প্রতিই থাকে আশাবাদী, তারই জন্য ব্যগ্র-ব্যাকুল এবং তারই বন্দেগী গোলামী-আনুগত্যের অধীন জীবন যাপন করে নিজের মনের ঐকান্তিক আগ্রহে। সে তার-ই অধীন করে দেয় তার নিজের ইচ্ছা-বাসনা-কামনা। নিজের প্রিয়তম জিনিস—নিজের জান-প্রাণ পর্যন্ত তার মর্জী পূরণের জন্য উৎসর্গ করে দিতে—কুরবানগাহে কুরবান করে দিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হয় না। মানুষের প্রকৃতি নিহিত এই ভাবধারাই মানুষের মধ্যে মঙ্গলময় মালাকূতী গুনাবলী জাগ্রত ও বলিষ্ঠ করে দেয়, মানুষের ব্যক্তিত্বকে করে দেয় পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ। পক্ষান্তরে এ ভাবধারা ভুল পথে প্রবাহিত হয়ে মানুষের মধ্যে শয়তানী ভাবধারাকে উগ্র ও তেজস্বী করে দেয়। ফলে মানুষকে পৌঁছিয়ে দেয় পাশবিকতার নিম্নতম পংকে। এই সত্তাকেই কুরআনের পরিভাষায় বলা হয় 'ইলাহ'। কিন্তু এ 'ইলাহ্' কে? কোন্ সত্তাকে 'ইল্যহ' রূপে নির্দিষ্ট করা চলে? এ একটা জটিল ও গুরুতর প্রশ্ন। ইতিহাস প্রমাণ করে, মানব সমাজে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সত্তাকে 'ইলাহ্' রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কখনও কোন মনগড়া দেব-দেবীকে এই মর্যাদা দেয়া হয়েছে। কখনও কোন নেতা, রাষ্ট্রপতি, রাজা-বাদশাহকেও 'ইলাহ' রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কখন কোন বংশ-পরিবার এই মর্যাদা পাওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে, কখনও জাতি ও দেশমাতৃকাকে 'ইলাহ্'র স্থলাভিষিক্ত করে নেয়া হয়েছে। এক কথা মানুষের বিবেক-বুদ্ধির উন্মেষ ও চেতনা লাভের এবং গৃহীত 'ইলাহ্' সম্পর্কে মানবীয় আশা-আকাঙ্খার বিপরীত কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত হতে দেখা যেতে শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে 'ইলাহ্র' উপর ভক্তি-শ্রদ্ধা-আস্থা হ্রাস পেয়ে গেছে। তাকে 'ইলাহ'র আসন থেকে নামিয়ে ধুলায় লুটিয়ে দিয়ে তাকে পদদলিত ও চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতেও মানুষ কসুর করেনি। কিন্তু মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক দাবি ও প্রবণতানুযায়ী একজন-না-একজন 'ইলাহ্'র উপর তার আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপিত থাকতেই হবে। তা ছাড়া মানুষের জীবন একেবারে অচল। এই কারণে সে একজন 'ইলাহ'কে খতম করে আর একজনকে 'ইলাহ'র আসনে বসিয়েছে। ফলে মানুষের উপর 'একজন ইলাহ' সব সময়ই পূর্ণ মর্যাদা সহকারে আসীন রয়েছে। বর্তমান যুগটা বলা যায়, জাতি ও

দেশমাতৃকার 'ইলাহ' হওয়ার যুগ। আর এই জাতি ও দেশমাতৃকার দোহাই দিয়ে তারই আচরণে কতিপয় মানুষ নিজেদের দৃশ্যমান ত্যাগ-তিতিক্ষার, চাতুর্য ও বুদ্ধিমত্তার বা যাদুমন্ত্রের ন্যায় ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা-ভাষণের সাহায্যে মানুষের উপর 'ইলাহ' হয়ে বসেছে। এরা নিজেদের ইচ্ছা ও মত অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করছে। এইভাবে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জিনিস বিভিন্ন সময়ে 'ইলাহ' হয়ে বসেছে। রাজা-বাদশাহ বা নেতা-ডিক্‌টেটরদের 'ইলাহ' হওয়ার যুগটা এখন বাসি ও অতীত। কেননা একজন ব্যক্তি ও তার বংশের কতিপয় লোকের লালসা-বাসনা-কামনার তরঙ্গের তালে তালে সমগ্র জাতির কোটি কোটি মানুষের নেচে বেড়ানোটা মনুষ্যত্বের জন্য চরম অবমাননাকর এবং মানবীয় মর্যাদা ও উন্নতির প্রবল প্রতিবন্ধক—একথা বুঝতে আজ আর কারোরই বাকী নেই। যদিও জাতির 'নেতারা' রাজা-বাদশাহ্‌র মর্যাদা লাভ করে চরম প্রতাপান্বিত ডিকটেটর বা 'পরম পূজ্য জনক' হয়ে বসেছে আজকাল অনেক দেশেই কোথাও কোথাও তাদেরও ধুলিসাৎ করে দিয়ে মনুষ্যত্বের মর্যাদা উন্নীত করার প্রাণপণ চেষ্টা চলছে। এমনি করেই 'ইলাহ্'র পরিবর্তন হয়েছে প্রচুর। অতীতে হয়েছে, এখনও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে—তাতে কোনই সন্দেহ নেই। তাই বিবেচ্য বিষয় হলো, মানুষের প্রকৃতিই যখন 'ইলাহ্' চায়, কাউকে না কাউকে 'ইলাহ্' না বানিয়ে যখন মানুষের নিস্তার নেই—এবং শুরুতে ত্রুটিপূর্ণ অসম্পূর্ণ অক্ষম ইলাহ্‌র প্রতি ঈমান গ্রহণের পর তার-ই মর্জী অনুযায়ী মানুষের জীবন চলতে থাকে, পরে সে ইলাহ্‌র সঠিক রূপ আত্মপ্রকাশ করা ও তার সাথে জনগণের নির্ভুল পরিচিতি লাভের পর তার প্রতি সে ঈমান উবে যায়—এই যখন অবস্থা, তখন এমন কোন 'ইলাহ' কি মানুষের জন্য থাকা উচিত ও বাঞ্ছনীয় নয়, যাঁর মধ্যে 'প্রকৃত ইলাহ্'র যাবতীয় গুণ পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান, যিনি সত্যিই সমগ্র বিশ্বলোকের একমাত্র 'ইলাহ্'' হওয়ার যোগ্য—অধিকারী—সমস্ত মানুষ কেবল তাঁকেই ইলাহ্ রূপে গ্রহণ করবে, মেনে নেবে এবং তাঁরই আনুগত্য করে চলবে সমগ্র জীবনে? মানুষের সাধারণ বিবেক বুদ্ধি এ প্রশ্নের জবাবে একথাই বলছে যে, এরূপ 'ইলাহ' একজন অবশ্যই হতে হবে ও থাকতে হবে। তাছাড়া মানুষের কোন উপায় নেই।

বিশাল বিশ্বলোকের কোন একটি অংশ কি এরূপ 'ইলাহ্' হওয়ার যোগ্য? যদি কোন অংশ হতে পারে বলে মনে করাই হয়, তাহলে বলতে হবে, মানুষই হতে পারে সেই ইলাহ্। কেননা যে কোন দিক দিয়ে বিবেচনা করা হোক, মানুষই বিশ্বলোকের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাবান অংশ। ক্রমবিকাশের দৃষ্টিতেও

যেমন, সৃষ্টিগত বিশেষত্বের দৃষ্টিতেও, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও, ধর্মীয় দৃষ্টিতেও তেমন। মানুষ ছাড়া বিশ্বলোকের অন্য কোন অংশকে যদি 'ইলাহ্' রূপে গ্রহণ করা হয়—তা চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা-পৃথিবী বা পাহাড়-নদী, জীব-জন্তু যে-ই হোক,—মানুষের বিবেক ও চেতনা তা কিছুতেই বরদাশত করতে প্রস্তুত হবে না। মানুষ নিজেই তার বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। তবে যতদিন মানুষের চেতনা মৃত ও প্রাণহীন থাকবে, ততদিন পর্যন্তই শুধু এধরনে ইলাহ্‌র 'ইলাহ্‌ত্ব' বজায় থাকতে পারে। কিন্তু মানুষের চেতনা তো আর চিরকাল মৃত ও নিস্পন্দ হয়ে থাকতে পারে না। তাই মানুষ তার তুলনায় হীন-নগণ্য কোন জিনিসকে ইলাহ্ বানিয়ে তার পূজা-উপাসনা ও বন্দেগী করতে থাকবে, কোনদিনই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে না—একথা কল্পনাও করা যায় না। বর্তমান জগতেও এর দৃষ্টান্তের কোন অভাব নেই। কিন্তু একজন মানুষকেই যদি 'ইলাহ্' রূপে গ্রহণ করা হয়, তাহলে সমগ্র বিশ্বলোক ও বিশ্বমানবতার 'একমাত্র ইলাহ্' হতে পারে এমন একজন মানুষওকি সারা দুনিয়ায় আছে?

এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এমন এক সত্তাকেই 'ইলাহ্' রূপে মেনে নেয়া যেতে পারে, যার ইলাহ্ হওয়ার মত যাবতীয় গুণ স্থায়ীভাবে বর্তমান। 'ইলাহ্'র মৌল গুণ হচ্ছে তাঁর সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক হওয়া। এইগুণ না বিশ্বলোকের কোন অংশের আছে, না কোন একজন মানুষের। এমন সত্তা অবশ্যই বিশ্বলোক-বহির্ভুত হবেন। কিন্তু অজ্ঞতা ও মুর্খতা সব সময়ই সেই প্রকৃত সত্তাকে পর্দার অন্তরালে লুকিয়ে রেখেছে এবং বিশ্বলোকের কোন একটি অংশকে ইলাহ্ রূপে গ্রহণ করেই মানব-প্রকৃতির এই ঐকান্তিক দাবিকে পূর্ণ করতে ও ঝালের স্বাদ তেতুঁল দিয়ে সেরে নিতে বাধ্য করেছে। আর এরূপ অবস্থা যতদিন থাকবে, ততদিন মানবতা গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতার সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে বাধ্য হবে। মানুষ এমন এমন ক্ষতি ও মারাত্মক অবস্থার সম্মুখীন হতে থাকবে, যে সম্পর্কে চেতনা জাগ্রত করা মানুষের পক্ষে বড়ই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। বস্তুত সেই প্রেরণাদায়ক শক্তি-ই মানুষকে মানবতার প্রকৃত কল্যাণের পথে চালাতে পারে, যা প্রকৃত 'ইলাহ্'র নির্ভুল ও সঠিক পরিচয় লাভ থেকে অর্জিত হয়। আর প্রকৃত 'ইলাহ্'র পরিচিত মুর্খতা ও অজ্ঞতার মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব নয়। সে জন্য সঠিক জ্ঞানের আবশ্যক। সে জ্ঞান 'ইলাহ্'র গুণাবলীর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দ্বারা পাওয়া যেতে পারে, যার সত্যতা ও যথার্থতার অকাট্য ও বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যাবে সমগ্র বিশ্বলোক ও বিশ্বমানব সংক্রান্ত জ্ঞান থেকে। কিন্তু বিশ্বলোক ও মানব-লোক সংক্রান্ত জ্ঞান—যাকে বলা হয় বিজ্ঞান—প্রকৃত ইলাহ্‌র সত্তা ও তাঁর গুণাবলী নির্ধারণ করতে পারে না। তার ক্ষমতা আছে শুধু নির্দিষ্ট

সত্তার সত্যতা প্রমাণ করার, যার ফলে প্রকৃত ইলাহ্‌র প্রতি মানুষের ঈমান সুদৃঢ় ও প্রত্যক্ষ হয় গড়ে উঠে। কিন্তু 'প্রকৃত ইলাহ্'র সত্তা নির্ধারণ করবে কে? তা করবে—করতে পারে ভিন্নতর কোন জ্ঞান। তাঁর গুণাবলী কি কি, তা-ও এই জ্ঞানের মাধ্যমেই জানা সম্ভবপর। ইসলামের পরিভাষায় সেই জ্ঞান হলো অহীর জ্ঞান, অহী-ই হলো সেই জ্ঞান লাভের একমাত্র সূত্র ও উৎস। এমনিতেই মানুষের মনে নানা প্রকারের ধারণা, অনুমান ও সন্দেহ সংশয় জাগতে থাকেই। মানুষের মনে আসে কত কথা, কত তত্ত্ব। কিন্তু সর্বপ্রকার কলুষতা ও মূর্খতা-বিভ্রান্তির মালিন্য থেকে মুক্ত ও পবিত্র সত্তাগণ কর্তৃক যেসব কথা জানিয়ে দেয়া হয়, সেই সব কথা-ই হয়, মানব প্রকৃতির ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি। সে-সব ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির চাইতে অধিক সত্য ও প্রকৃত যথার্থ কথা আর কিছুই হতে পারে না। মানুষ ছাড়া বিশ্বলোকের অন্য কোন অংশের যদি কথা বলার শক্তি থাকত, তাহলে সমগ্র বিশ্বলোক—বিশ্বলোকের প্রত্যেকটি অংশেরই মুখে এই কথা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠত। কিন্তু মানুষ ছাড়া বিশ্বের আর কোন অংশের বাকশক্তি নেই। তবু অবস্থার ভাষা দিয়ে সমগ্র বিশ্বলোক এই কথার সত্যতাই প্রমাণ করে। এ সব কথা কোন মানুষের স্বকপোলকল্পিত বা মনগড়া হতে পারে না। কেননা মনগড়া কথা কখনই বিশ্ব-প্রকৃতি নিগূঢ় সত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে না। এই কারণে মানুষ হিসেবেই বিশ্বমানবের কর্তব্য হচ্ছে—এই সব কথার প্রতি অকৃত্রিম দৃঢ় প্রত্যয় স্থাপন, সেই কথাগুলো যথাযথভাবে হৃদয়মন দিয়ে গ্রহণ, মেনে নেয়া তদনুযায়ী জীবন যাপন করতে প্রস্তুত থাকা। এই সব কথাই অহী এবং যে-সব পবিত্র হৃদয়ে এই সব কথা উদ্রিক্ত হয়, ইসলামের পরিভাষায় তাদের-ই বলা হয় নবী-রাসূল। নবী-রাসূলগণ সর্বপ্রকার বৈষয়িক ও বস্তুগত সংশ্রব-আকর্ষণ ও আসক্তি (attachment) থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র হয়ে থাকেন। এইজন্য যথার্থভাবেই তাদের বলা হয় মাসুম—নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ। বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বলোকের এক-একটি অংশ ও অনুকে বাকশক্তি দিয়ে সমগ্র বিশ্বলোক দ্বারা স্বীয় কথার সত্যতা প্রমাণ ও স্বীয় মর্জী প্রকাশ করানোর পরিবর্তে এসব মাসুম ব্যক্তিদের হৃদয়ে সবকিছুই উদ্রিক্ত করে দেন এবং তাদের মাধ্যমেই সমগ্র বিশ্বমানবকে নিজের বক্তব্য ও মর্জী সম্পর্কে অবহিত করে তুলতে চেয়েছেন। মানুষকে যে বোধ ও অনুভূতি শক্তি দেয়া হয়েছে, দেয়া হয়েছে গ্রহণ ও বর্জনের স্বাধীনতা, তা এ ভাবেই সার্থক ও সফল হতে পারে। এই সব কথা পুরাপুরি জানা মানবতার প্রকৃত কল্যাণের জন্য অপরিহার্য। এ সব কথার দ্বারাই সেই সব 'প্রেরণাদায়ক' লাভ করা সম্ভব, যা মানবতার কল্যাণ স্থাপক। এসব কথা থেকে শুধু মানব-কল্যাণের কারণ ও প্রেরণাদায়কের কথাই জানা যায় না, সেই পথেরও সন্ধান পাওয়া যায়, যা বিশ্বব্যবস্থার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আর এ পথটাই

এমন যে, মানুষ এ পথ যখন গ্রহণ করে তখন সমগ্র বিশ্বব্যবস্থা তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ লাভের সাথে পূর্ণ মাত্রায় সঙ্গতিসম্পন্ন ও একান্তই অনুকূল হয়ে দাঁড়ায়। তার লালন-পালন ও প্রবৃদ্ধি সাধনে ঠিক সেই নিয়মে ও তেমনিভাবে খোরাক পরিবেশন করে যেমন একটা বীজকে ক্রমবিকাশ দানের জন্য করে থাকে।

আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসা অহী উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে যে, প্রকৃত ইলাহ্ এক, একক ও অনন্য। সে ইলাহ্ হলেন মহান আল্লাহ তা'আলা। তিনিই সমগ্র বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তা। তিনিই সমগ্র বিশ্বলোককে একটা সুংসবদ্ধ ও সুসংগঠিত ব্যবস্থার অধীন অস্তিত্ব দান করেছেন। সমগ্র বিশ্বলোককে তিনি সেই ব্যবস্থার ভিত্তিতেই পরিচালিত করেছেন। এমন একটা সময় অবশ্যই আসবে, যখন এই বিশ্বব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তা'আলা একটা নবতর ব্যবস্থা কায়েম করবেন। এই ব্যবস্থাটা হবে চিরন্তন, শাশ্বত, অক্ষয় ও চিরস্থায়ী। মানুষ যদি বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় আল্লাহ্‌র অহী অনুযায়ী নিজেদের সামষ্টিক জীবন গড়ে তোলে ও পরিচালিত করে, তাহলে তারা নিজেদের মধ্যে সেই ব্যক্তিত্বকে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, যা এই দ্বিতীয় ব্যবস্থায় অতীব উত্তম মর্যাদার অধিকারী হবে। আর তা না করলে মানুষ সেখানে চিরন্তন লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা এবং কঠিন মর্মান্তিক অবস্থার মধ্যে নিমজ্জিত হবে।

এ-ই হচ্ছে এমন সব কারণ—প্রেরণাদায়ক, যা এই ব্যবস্থানুযায়ী মানুষকে এক সরল-সোজা ও ঋজু পথে সব সময় চালিয়ে নিতে থাকে। আর দ্বিতীয় ব্যবস্থায় তা জান্নাতী জীবন দানে তাকে ধন্য করে। এক আল্লাহ্ তা'আলাকেই প্রকৃত ইলাহ্ ও এক, একক ও অনন্য ইলাহ রূপে জানা, মেনে নেওয়া এবং পরকালীন জীবনের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় রাখা হল মানবীয় জীবন-যাত্রার সূচনা। আর এই দ্বিতীয় জীবন হচ্ছে তার-ই অনিবার্য পরিণতি। সূচনা ও পরিণতি বিন্দুর মধ্যরেখা সর্বাধিক ক্ষুদ্র ও সরল-সোজা একটিই হতে পারে, গণিত শাস্ত্রের এটা একটি সিদ্ধান্ত, মানব জীবনের কার্যসূচী যতদিন পর্যন্ত এ দুটি বিন্দু—এ দু'প্রকারের প্রেরণাদায়কের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে থাকবে, ততদিন অন্যান্য প্রকারের প্রেরণাদায়ক নিজেদের কাজ অবাধে স্বাধীন ও অত্যন্ত প্রভাবশীলভাবে চালিয়ে যেতে পারবে না। এই কারণে কার্য ও কারণের ধারাবাহিকতা তার স্বাভাবিক নিয়ম-নীতির মধ্যে চলতে থাকবে। নফসের কামনা-বাসনা, তড়িৎফল লাভের আবেগ এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য ইলাহ্‌র অন্ধ অনুসরণের কারণে যে-সব ধ্বংসাত্মকত ও কৃত্রিম কারণের উন্মেষ ঘটে, তা আর উন্মেষিত হতে পারবে না। আর গোটা সমাজ বিপর্যয়ের গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়ে-পেয়ে প্রকৃত ও শাশ্বত কল্যাণের দিকে গতিবান হবে।

পর্যবেক্ষণ ও তার পরিধি

পূর্ববর্তী আলোচনায় একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, বস্তুসমূহের প্রত্যক্ষ সরাসরি ও স্থূল পর্যবেক্ষণে (observation) সেগুলোর মৌল রূপ ধরা পড়ে না। বরং আমাদের অনুভূতিসমূহ বস্তুসমূহের প্রকৃত মৌল সত্তা সম্পর্কে আমাদিগকে অনেক সময় ধোঁকায় ফেলে দেয়। তার একটা বিশেষ কারণও রয়েছে। সে কারণটি হল আমরা যে প্রপঞ্চের পর্যবেক্ষণ করি, তা নিজেদের সীমাবদ্ধ পরিমণ্ডলের মধ্যে একটা সীমাবদ্ধ পর্যবেক্ষণ মানদণ্ডের ভিত্তিতেই করে থাকি। এই পর্যবেক্ষণের ফলে সেই বস্তু সম্পর্কে আমাদের নানা অনুভূতি দাঁড়িয়ে যায়। আমাদের পর্যবেক্ষণের পরিমণ্ডল যখন কিছুটা বিস্তৃতি লাভ করে তখন সেই জিনিসই ভিন্নতর একটা অনুভূতি জাগায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি আরও খোলাসা করার চেষ্টা করা হচ্ছেঃ

১. মনে করুন—কোন শহরের মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া একটি সড়ক। তার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত একটানা ঋজু দেখা যাবে। কিন্তু সেই সড়কটিই যখন আমরা উড়োজাহাজে বসে দেখব, তখন দেখার পরিমণ্ডল প্রশস্ততর হওয়ার কারণে সড়কের যতটা অংশ শহরের মধ্য থেকে এক নজরে দেখা যায়, সে অংশটা কয়েক গুণ বড় দেখা যাবে। তখন তা একটানা সরল রেখার মত মনে হবে না, সেরূপ অনুভূতিও জাগবে না। অথবা কেবল উপর থেকে দেখে যদি তার বাঁকা হওয়ার অনুভূতি জাগে, তাহলে শহরের ভিতরে থেকে সে সড়কটির কিছু অংশ আলাদা আলাদা ভাবে না দেখা পর্যন্ত সেই সড়কটিকে সরল রেখার মত একটানা মনে করা যাবে না। একটি-ই সড়ক। শহরের মধ্য থেকে সেটিকে আমরা সরল সোজা ঋজু দেখলাম। কিন্তু উড়োজাহাজে উঠে দেখলে তা আকাবাকা দেখা যাবে। এতে করে জানা গেল যে, সরল রেখা ও বাঁকা রেখা কোন স্বতন্ত্র গুণসম্পন্ন রেখা নয়। সরল রেখার মত দেখালে তা সর্বাবস্থায় সরল রেখাই দেখা যাবে, এমন ধরা-বাঁধা কোন কথা নেই।

২. ধূসর বালুকাময় প্রান্তরে খেজুর গাছ বা তার মত কোন জিনিস, যা মাটির উপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা দূর থেকে দিনের বেলা প্রখর রৌদ্রের মধ্যে দেখলে বালুকার উপর তার প্রতিচ্ছবি এমন পরিদৃষ্ট হবে, যেন পানির তীরে কোন জিনিস দাঁড়িয়ে আছে এবং তার-ই প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে। ফলে লোকেরা মনে করে বসে যে, ওখানে পানি আছে। কিন্তু নিকটে পৌঁছে তারা পানি দেখতে পায় না, দেখে রুক্ষ শুষ্ক বালুকারাশি। এই প্রপঞ্চকেই বলা হয় মরীচিকা। বালুকাময় প্রান্তরের অংশ প্রখর রৌদ্র তাপে দূর থেকে পানি আর নিকট থেকে বালুকা পরিদৃষ্ট হয়। অনুভূতির এই পার্থক্য ও পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ-পরিমণ্ডলের পরিবর্তনের কারণেই হয়ে থাকে।

৩. সাদা ও কালো বর্ণের গুড়া (Powder) পরস্পর সংমিশ্রিত করা হলে সংমিশ্রিত গুড়াগুলো একটি তৃতীয় বর্ণ ধারণ করবে। তা হবে ছাই রঙ। সেই ছাই রঙের গুড়া-স্তুপের উপর দিয়ে গুড়া বিন্দুর আকারের একটা পোকা যদি হামাগুড়ি দিয়ে চলতে থাকে, তাহলে সে পোকাটি কি ছাই বর্ণের অনুভূতি পাবে? সেটি তো কখনও সাদা আর কখনও কালো বর্ণ দেখতে পারে। এ পোকাটির নিকট ছাই বর্ণের কোন অস্তিত্বই নেই। এই বিশাল বিস্তীর্ণ সীমা-পরিসীমাহীন মহাবিশ্বে মানুষ ঠিক এই পোকাটির অবস্থারই অধিকারী। তার অধিক কোন অবস্থা তার নয়। পোকাটি ছাই বর্ণের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে থেকেও সেই গুড়াগুলিকে ছাই বর্ণের দেখতে পায় না। আমরা যদি এই গুড়াগুলোকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখি, তাহলে আমরাও সেই কালো ও সাদা বর্ণের গুড়াই দেখতে পাব। তাহলে বলা যায়, একই বস্তু পর্যবেক্ষণ-পরিমণ্ডলের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার বর্ণ ও স্বরূপও ভিন্নতর পরিদৃষ্ট হয়।

৪. একটা ক্ষুরের তীব্র শানিত ও সোজা ঋজু ধার দেখলে বাহ্যত সোজাই দেখা যাবে। এটা সাধারণ পর্যবেক্ষণ। কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখলে তা চিরুণীর মত দাঁতালো দেখা যাবে। ক্ষুরের ধারের খোলা চোখের প- বেক্ষণ সরল রেখার ধারণা জন্মায়। কিন্তু সেই ধারের অণুবীক্ষণী পর্যবেক্ষণ বাঁকা রেখার চিত্র দেখায়। বিজ্ঞানের খাতা থেকে এ ধরনের হাজার হাজার দৃষ্টান্ত পেশ করা যায়। তা থেকে এ সত্য সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠে যে, মানুষ কোন জিনিসেরই আকার-আকৃতি-রূপ, সংগঠন, সংযোজন নির্ধারণ করতে পারে না। পর্যবেক্ষণ-পরিমণ্ডল ও পর্যবেক্ষণ-মানদণ্ড বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বস্তুসমূহের

স্বরূপ বদলে যায়। উপরের দৃষ্টান্তগুলো নিষ্প্রাণ জড়বস্তুসমূহ থেকে দেয়া হয়েছে। এগুলোর পর্যবেক্ষণ ও এগুলো নিয়ে পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ করা হলে বিভিন্ন ধরনের ফল প্রকাশ পাবে। ফলে পর্যবেক্ষণকারী ও বিশ্লেষণকারীরা কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবে না। তারা সব সময়ই সন্দেহ-সংশয় ও দ্বিধা-কুণ্ঠার মধ্যেই পড়ে থাকে। একথা প্রত্যেক বিজ্ঞানবিদই স্বীকার করেন। কিন্তু সীমাবদ্ধ পর্যবেক্ষণ ও সংকীর্ণ পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ থেকে যে সব ফল তার সম্মুখে প্রকাশিত হয়, তার-ই ভিত্তিতে তাকে রচনা করতে হয় ধারণা প্রকল্প ও মতাদর্শ। এভাবেই পরীক্ষণ-নিরীক্ষণকে সম্মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্য সহজতা ও পথ-প্রদর্শন লাভ হয়ে থাকে! কিন্তু সে এসব মতবাদ মতাদর্শকে কখনই কোন এক পর্যায়ে পৌঁছেই চূড়ান্ত ও সর্বশেষ বলে মনে করে না, তার দাবিও তার নেই।

নিষ্প্রাণ নির্জীব পদার্থ সম্পর্কে যখন এই অবস্থা—সে সম্পর্কেও আমরা যখন কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি না—তাহলে জীব ও প্রাণীদের ক্ষেত্রে তো তা আরও কঠিন বা অসম্ভব। কেননা জীবন্ত ও প্রাণবন্ত 'জিনিসে'র সংগঠন ও সংযোজন তদপেক্ষাও অধিক জটিল ও দুরূহ। তাদের সম্পর্কে আমাদের মনে জাগা সাধারণ অনুভূতির কি-ই বা মূল্য! জীবন্ত ও প্রাণবন্ত জিনিস সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যা কিছু পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ চালানো হয়েছে, তার সারনির্যাস হল, সমস্ত জীবন্ত-প্রাণবন্ত জিনিসই—তা উদ্ভিদ বা জীব ও প্রাণীকুল যা-ই হোক—অণুবীক্ষনী গাছালি থেকে শুরু করে বড় বড় গাছপালা এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পোকা থেকে মানুষ পর্যন্ত—সব কিছুই একই জড় বস্তু থেকে সৃষ্ট। বিজ্ঞানের পরিভাষায় এই জড়-বস্তুকে বলা হয় protoplasm উদ্ভিদ-অংকুরের কোন একটা অংশ ধরুন, শিকড় থেকে ফল ও ফুল পর্যন্ত; কিংবা কোন বড় ও বিরাট বপু জন্তু-অস্থি থেকে তা রক্ত পর্যন্ত এই একই জড়-বস্তুরই বিভিন্ন রূপ ও অবস্থা মাত্র। তা বিভিন্ন বিন্যাসে বিভিন্ন অঙ্গে একটা বিশেষ সময়-কাল পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে। তার পরে তা সেসব মৌল উপাদানের সাথে একাকার হয়ে মিলে-মিশে যায়, যার সংমিশ্রণে তা তৈরী। 'রূহ্ বা আত্মার প্রকাশ এই জড়-বস্তুতেই সংঘটিত হয়। এই কারণে তাকে living matter বা 'জীবন্ত বস্তু'ও বলা হয়। সব বস্তুর মধ্যেই একই ধরনের মৌল উপাদান পাওয়া যায়, পারস্পরিক সাম স্যের এ-ই হল একটি মাত্র দিক। এছাড়া এগুলোর মধ্যে আর কোন সামঞ্জস্য নেই।

প্রোটোপ্লাজমের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে যেই মৌল উপাদানগুলী পাওয়া গেছে, তা হচ্ছে, কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, গন্ধক, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ, ক্লোরিন ইত্যাদি। আর এগুলোই মাটির রাসায়নিক অংশ। মানুষের গোটা দেহই প্রোটোপ্লাজম থেকে তৈরী। তাই কুরআনের মানব সৃষ্টি সংক্রান্ত ঘোষণা ঃ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ই সত্য, অতীব উচ্চমানের ঘোষণা এটা। খন খন ধ্বনির মত মাটির গারা থেকে—প্রোটাপ্লোজমে মিশ্রিত মৌল উপাদানসমূহের আনুপাতিক পরিমাণ কি, বিজ্ঞান তা জানতে পেরেছে; কিন্তু এ তত্ত্ব ও রহস্য এখন পর্যন্তও অনুদ্ঘাটিতই রয়ে গেছে যে, সেই বিশেষ সংমিশ্রণ-বিন্যাসটি কি, যে বিন্যাস অনুযায়ী এ উপাদানসমূহকে সংমিশ্রিত করা হলে তাতে রূহ বা প্রাণের সঞ্চার হয়। বিজ্ঞান জগত এ রহস্য উদঘাটনে দীর্ঘকাল থেকে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে এসেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ পর্যায়ের অ-আ ক-খ-ও জানতে পারেনি। এজন্য কোন 'প্রকল্প' বা মত রচনা করা তো সুদূরপরাহত ব্যাপার। এ থেকে প্রমাণিত হল যে, প্রাণবন্ত জিনিস সম্পর্কে আমরা যতটা জানতে পারি তা সে পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, যে পর্যন্ত আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ হয়ে আছে নিষ্প্রাণ জীবনহীন বস্তুনিচয় সম্পর্কে। বিজ্ঞান তা থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণও সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে পারেনি। সুদূর ভবিষ্যতেও তেমন কিছু সম্ভব হবে বলে কোন বিজ্ঞানীর এক বিন্দু বিশ্বাস নেই। এই কারণে নিষ্প্রাণ বস্তুনিচয়ের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ-নিরীক্ষণের পর যে সব 'প্রকল্প' ধারণা বা মত নির্ধারণ করা হয়, তা কখনও জীবন্ত ও প্রাণবন্ত জিনিস সম্পর্কে খাটানো যেতে পারে না। পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে যা সত্য এক্ষেত্রেও তা-ই সত্য হবে—এমন কথা কিছুতেই বলা যেতে পারে না। জীবন্ত ও প্রাণবন্ত জিনিস সম্পর্কে তত্ত্ব ও তথ্যাদি অর্জনের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্নতর পরিমণ্ডল ও মানদণ্ড গ্রহণ করতে হবে। একথা স্বীকার করে নিতে হবে যে, 'রূহ' স্বতঃই এমন একটা শক্তি, যার অবস্থিতিটাই শুধু জানা যায়, তার নিগূঢ় তত্ত্ব ও সত্য জানা যায় না। কেননা যে দেহে 'রূহ' অবস্থিত, তার অবস্থা-ই স্বতন্ত্র। সে দেহ থেকে রূহ যখন নিষ্ক্রমিত হয়, তখন তার অবস্থা ও স্বরূপ হয় সম্পূর্ণ ভিন্নতর। কিন্তু রূহের স্বরূপ বুঝবার কোন উপায় নেই।

পর্যবেক্ষণ-মানদণ্ড ও মানুষ

বস্তুত মানুষের ব্যাপারটা অন্যান্য জীবন্ত ও প্রাণবন্ত সত্তার তুলনায় অনেক

বেশী জটিল ও দুরূহ। কেননা মানুষের বস্তুগত ও জীবন-প্রাণগত সত্তার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্তাও রয়েছে। রূহের সন্ধান করা ও তার নিগূঢ় সত্য ও তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভের ব্যাপারে বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত একান্তভাবে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে-ই রয়েছে। তাহলে মানুষের আত্মিক ও নৈতিক সত্তার কোন ব্যাখ্যা দেয়াই তো সম্ভবপর নয়। মানুষের আত্মিক ও নৈতিক সমস্যাবলী বুঝতে ও বোঝাবার জন্য বিজ্ঞানের কাছ থেকে কি সাহায্য পাওয়া যেতে পারে? বস্তুবাদী দার্শনিকরা এ প্রশ্নে একেবারেই লা-জওয়াব। ঠিক এই কারণেই নাস্তিক্যবাদী দর্শনে নৈতিকতা ও আত্মা বা আত্মিকতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার কোন অধ্যায়ই খুঁজে পাওয়া যায় না। নাস্তিকতাবাদী বস্তুবাদী দার্শনিকদের দৃষ্টিতে মানুষের নৈতিক ও আত্মিক বা আধ্যাত্মিক কোন সমস্যাই নেই। মানুষের এ ধরনের কোন দিক বা সমস্যা থাকতে পারে—তাদের কল্পনায়ও আসেনি। তারা যা কিছু চিন্তা-ভাবনা-গবেষণা করে, তা করে নিতান্তই বস্তুগত, বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক ব্যাপার সম্পর্কে। তা ছাড়া আর কোন কিছুতে তাদের মন ও মগজ কিছুমাত্র আকৃষ্ট হয় না, এক বিন্দু কাজ করে না। বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণের যে সব মানদণ্ড আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করেছে, তন্মধ্যে কোন একটি মানদণ্ডও মানুষের নৈতিকতা ও আত্মিকতার বিন্দুমাত্রও পর্যবেক্ষণ করাতে পারে না। তাই নৈতিকতা ও আত্মিকতা পর্যবেক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্নতর মানদণ্ডের প্রয়োজন এবং তদ্দ্বারা-ই তা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। সে মানদণ্ডকে অবশ্যই এক পূর্ণাঙ্গ মানুষের জীবন কর্তৃক নির্ধারিত, মানুষের এই পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বই মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি, বিবেক-বুদ্ধি, নৈতিক ও আত্মিক দিক পরিমাপ করার মানদণ্ড হওয়ার যোগ্য। কিন্তু এ ব্যক্তিত্বকে মানবতা পরিমাপ করার মানদণ্ড কি করে মেনে নেয়া যেতে পারে? এ প্রশ্নের জবাবে অতি সহজেই বলা চলে, মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করার পদ্ধতি সর্বত্র এক ও অভিন্ন। অন্যান্য আরও শত মানদণ্ড যেভাবে গ্রহণ করা হয়েছে, এটাও ঠিক তেমনিভাবে মেনে নেয়া হয়েছে। যদিও বিজ্ঞান কর্তৃক নির্ধারিত মানদণ্ড বস্তুসমূহের মাত্র একটি বা দুটি দিকেই পর্যবেক্ষণ করাতে পারে, কিন্তু এ ব্যক্তিসত্তা একটা পূর্ণাঙ্গ মানদণ্ড। এ মানদণ্ড মানুষের সর্বদিক ও সকল বিভাগেরই পর্যবেক্ষণ করাতে সক্ষম। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের—স্বভাবগত, বিবেক-বুদ্ধিগত, নৈতিক ও আত্মিক এই চারটি দিকই এবং সামষ্টিক জীবনের সমস্ত শাখা-প্রশাখা—সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি সবকিছুরই পরিমাপ

এই পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিসত্তার মানদণ্ডের ভিত্তিতে করা খুবই সম্ভবপর। এই ব্যক্তিসত্তা এক মহান ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। এর অপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব মানবেতিহাস কোন কালেই পেশ করতে সক্ষম নয়। আমরা যদি এই পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক ব্যক্তিসত্তাকে মানবজীবন পরিমাপ করার মানদণ্ড রূপে গ্রহণ করতে প্রস্তুত না-ই হই, তাহলে মানবতার পর্যবেক্ষণের জন্য আমরা কোন মানদণ্ডই কোথাও এবং কখনই লাভ করতে পারব না। ফলে মানব জীবনের সমস্যাবলী সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান মারাত্মকভাবে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আর তার পরিণামে মানুষের সমস্যাবলীর কোন সমাধান বের করাই আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না। এই মানদণ্ডকে প্রত্যাখ্যান করার পর বস্তুবাদী দার্শনিকগণ মানুষের সামাজিক-সামষ্টিক জীবনের একটা নেহায়েত হালকা স্থূল ও একচোখা যাচাই করে মনে করে নিয়েছে যে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাই মানুষের একমাত্র সমস্যা। এতদ্ব্যতীত মানুষের আর কোন সমস্যাই নেই। কিন্তু মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রসমূহের উপর মানুষের নৈতিক ও আত্মিক দিকের যে সর্বাত্মক প্রভাব থাকে, এ কথাটা তাদের সম্পূর্ণ অজানাই রয়ে গেছে। এ বিষয়ে তারা একেবারে অজ্ঞ ও অন্ধ। ঠিক এই কারণে মানুষের সেই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত মানবতার পক্ষে কল্যাণকর কোন সমাধান পেশ করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। পূর্বে আমরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি যে, নিরেট বস্তুগত জিনিসসমূহেরও স্থূল অ-গভীর অসূক্ষ্ম অধ্যয়ন ও সেগুলির অন্তর্নিহিত নিগূঢ় সত্যকে সুস্পষ্ট ও প্রকট করে তুলতে সক্ষম নয়। এ ধরনের অধ্যয়নের ভিত্তিতে যখনই কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, তা অবশ্যই ভুল হবে। তাহলে মানুষের স্থূল অধ্যয়ন দ্বারা মানবতার নিগূঢ় তত্ত্ব ও সত্য বুঝতে পারার দাবি করা এবং নিছক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাসমূহকেই মানুষের মৌল ও একমাত্র সমস্যা ধরে নিয়ে তার মনগড়া সমাধানকে জোর করে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করা কতখানি অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক পদক্ষেপ, তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। কোন সুস্থ বিবেক-সম্পন্ন মানুষই এই অযৌক্তিক পদক্ষেপকে মেনে নিতে পারে না। মানুষের নৈতিক ও আত্মিক দিককে অগ্রাহ্য বা উপেক্ষা করে কিংবা তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে মানবতার কল্যাণের জন্য কোন সুফলপ্রদ পরিকল্পনা তৈরী করা সম্ভবপর নয়, সম্ভব নয় মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার কোন সমাধান বের করা।

এটা সাধারণ বুদ্ধির (common sense) কথা যে, মানুষের নৈতিক ও আত্মিক সমস্যাগুলোর নির্ভুল সমাধান হয়ে গেলেই তার বস্তুগত ও বৈষয়িক সমস্যাবলীর সমাধান স্বতঃই হয়ে যাবে। সেজন্য স্বতন্ত্রভাবে কোন মতাদর্শ বা নীতি গ্রহণের আদৌ কোন প্রয়োজনই থাকবে না।

নৈতিক ও আত্মিক সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য যেসব নীতি নির্ধারিত হয়েছে তার ভিত্তিতে বৈষয়িক ও বস্তুগত সমস্যার সমাধান করা কিভাবে সম্ভব, তা স্বতন্ত্রভাবে আলোচিতব্য। অবশ্য আমার বহু কয়টি বইতেই তা বিস্তারিতভাবে আলোচিতও হয়েছে। এখানে এতটুকু ইঙ্গিতই যথেষ্ট যে, মানবতার পুনর্গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হওয়া যতগুলি আন্দোলনের সন্ধান বিশ্ব-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়, তা এক-নজরে দেখলেও একথা সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারা যায়। মানুষের বস্তুগত সমস্যাবলীকেই মানুষের মৌল সমস্যা মনে করে—অন্য কথায় মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ হলেই সমগ্র মানবতা উন্নতির উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে যাবে বলে বিশ্বাস করে যেসব আন্দোলন কাজ শুরু করেছিল, সেগুলি তাদের প্রথম প্রতিষ্ঠাকাল থেকে চরম উন্নতির সময় পর্যন্ত একই নীতির উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি, পারেনি মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যারও সমাধান করতে। এ ধরনের সব কয়টি আন্দোলনই ইউরোপে সূচিত ও উত্থিত হয়েছে। তার মধ্যে কতগুলোর তো একমাত্র লক্ষ্য ছিল দেশের সমগ্র উৎপাদন-উপায়কে আন্দোলন নেতৃবৃন্দের দখলে নিয়ে নেয়া। অতপর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নিজেদের ইচ্ছা ও পলিসি কার্যকরকরণ। এজন্য দেশের সমস্ত মানুষের মৌলিক অধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতা হরণ করা এবং মত প্রকাশ ও সমালোচনার পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া একান্তই অপরিহার্য বলে তারা মনে করেছে। কেননা তাছাড়া দেশের ও জনগণের উপর নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও খোদায়ী কায়েম করা কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না। সমূহবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ ও ফ্যাসীবাদী আন্দোলন এই ধরনেরই ছিল। কিন্তু দুনিয়া দেখেছে, এখনও দেখছে যে, এসব আন্দোলন কোনকালেই সফলকাম হতে পারেনি। সেসব থেকে দুনিয়া কোন শাশ্বত নীতি লাভ করতে পারেনি, পারেনি জীবনের কোন মতাদর্শের অধিকারী হতে।

বস্তুবাদী আন্দোলন ও মানবতার পুনর্গঠন

বস্তুবাদী আন্দোলনের ভিত্তিগত আকীদা হচ্ছে, বিশ্বলোকে যা কিছু ঘটেছে,

ঘটে আসছে ও ঘটতে থাকবে, তা বস্তুরই রকম-বে রকমের তৎপরতা ও গতিবিধির বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। আর মানুষও এই বিশ্বলোকেরই একটা অংশ। এই কারণে তারাও বস্তু বা জড় এবং তার প্রপঞ্চ সম্পর্কে জ্ঞানতত্ত্ব ও তথ্যের পরিধি যত ব্যাপক হতে থাকবে, মানবতার পুনর্গঠনের পথ ততই উন্মুক্ত হতে থাকবে। অন্য কথায় বিজ্ঞানের উন্নতি ও উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে মানবীয় সমস্যাবলীও উদ্ঘাটিত হতে থাকবে এবং তার সমাধানও হয়ে আসবে।

পূর্বে যেমন বলেছি, বিজ্ঞানের উন্নতি উৎকর্ষের ফলেই মানুষের মগজ ও বহির্বিশ্বের মাঝে যে সম্পর্ক রয়েছে তা আরও উন্মুক্ত ও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। আমরা এ-ও বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি যে, কোন বিশেষ কাজ করতে কিংবা কোন বিশেষ ধারণা মনের মধ্যে স্থান দিতে বাধ্য করে যে ঘটনা, সেই ঘটনার মূলে নিহিত কারণসমূহের খোঁজ করতে গিয়ে আমাদিগকে বস্তুগত কারণের সীমা পার হয়ে এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে পৌছতে হয়, যেখানে বস্তুগত কারণের ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়ে যায়! অতপর কারণের ধারাবাহিকতা হয়ে যায় নিতান্তই মনস্তাত্ত্বিক। কিন্তু বস্তবাদী আন্দোলনে বিশ্বাসী লোকেরা এসব মনস্তাত্ত্বিক 'কারণ'কেও বস্তুবাদী 'কারণে'র মধ্যে গণ্য করে। কেননা তাদের মতে যে মগজ চিন্তা-গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে এ পর্যন্ত পৌছায় তা নিজেই বস্তুগত জিনিস। কাজেই তার চিন্তা করা সব কথা বস্তুগত-ই হবে। কিন্তু বস্তুবাদীদের এই কথাটা কতখানি সত্য, যথার্থ কিংবা ভুল, তা নিম্নে প্রদত্ত ব্যাখ্যা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

পদার্থ বিদ্যায় বিজ্ঞান এ পর্যন্ত যতটা উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভ করেছে, তার চূড়ান্ত কথা হচ্ছে, শক্তি (energy) কার্যে (action) পরিবর্তিত হতে থাকে। কোন শক্তি-ই কার্যে পরিণত ও পরিবর্তিত না হয়ে থাকতে পারে না—এই মহাসত্য পর্যবেক্ষিত হয়েছে। বস্তুর 'একক' হচ্ছে পরমাণু (atom), তা শক্তিসমূহের সমষ্টি। তা একত্রিত ও জড়ীভূত হয়ে পরমানু গঠন করে। এ শক্তিসমূহ বস্তু থেকে নিঃসৃত হতেই থাকে। আর যত পরিমাণ 'শক্তি' নিঃসৃত হয় ততটাই 'কার্যে' পরিবর্তিত হতে থাকে। এই কারণে প্রত্যেক গতি ও কার্যকে শক্তিসমূহের এককের হিসেব লাগিয়েই সুনির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

কিন্তু আমাদের চিন্তাধারা, ধারণা কল্পনা নিছক মনস্তাত্ত্বিক কার্যকলাপ। এ থেকেই তো আমাদের হৃদয়ে দৃঢ় সংকল্প ও ইচ্ছা জেগে ওঠে। কিন্তু এর

কোনটাই শক্তির এককে ওজন ও পরিমাপ করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞান এখানে একেবারেই অসমর্থ। এ-ই যদি হয় আসল অবস্থা, তাহলে মানব মনের চিন্তা কল্পনা-ধারণা-আবেগের স্বরূপ সম্পর্কে বিজ্ঞান আমাদের কি বলতে পারে? কোন্ সব কারণ আমাদের দ্বারা ভাল ও মন্দ কাজের মধ্যে পার্থক্য করায় বিজ্ঞান তার উন্নতির উৎকর্ষের উচ্চতম শিখরে পৌঁছেও এই বিষয়ে আমাদেরকে কিছুই বলে দিতে পারে না।

অমুক কাজটি গঠনমূলক আর অমুক কাজটি ক্ষতিকর, মারাত্মক—এই চিন্তা আমাদের মগজে কেমন করে জাগে? অথচ সত্য কথা এই যে, গঠনমূলক কাজ ও ধ্বংসাত্মক কাজ—ভাল ও মন্দ কাজের পার্থক্যবোধই মানবতার দৃষ্টিতে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ বিশেষত্ব সমন্বিত।

কোন কোন কাজকে ভাল কাজ মনে করে তা করতে গিয়েছে এবং তা করার ব্যাপারে নানাবিধ কষ্ট-দুঃখ অকাতরে ভোগ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত নিজের জীবন ও প্রাণ পর্যন্ত কুরবান করেছে—মানবেতিহাসে এমন লোকের সংখ্যা গুণে শেষ করা যায় না। পক্ষান্তরে এমন লোকের সংখ্যাও বে-হিসেব, যারা কেবল সেই কাজই করেছে, যা করার জন্য তাদের ইচ্ছা জেগেছে কিংবা যে কাজে তারা কোন উপস্থিত স্বার্থ বা সুখ দেখতে পেয়েছে।

যদি ধরে নেয়া যায় যে, এমন একটা সময় অবশ্যই আসতে পারে যখন বিজ্ঞানের আরও উন্নতি ঘটবে এবং পরিমাণের এককে আমাদের চিন্তা-কল্পনা-হৃদয়াবেগও পরিমাপ ও ওজন করা সম্ভবপর হবে। কিন্তু এইরূপ যদি সম্ভবপর হয়ও, তবু বিজ্ঞানের সাহায্যে মানবতার পুনর্গঠনের (reconstruction) কাজ করানো সম্ভবপর হবে না। কেননা ভাল ও কল্যাণকর কাজ করার ইচ্ছা ও চিন্তা এবং মন্দ ও ক্ষতিকর কাজ করার চিন্তা ও ইচ্ছা জাগার মূলে যত যত পরিমাণের শক্তি ব্যয় হবে তার পার্থক্যও কি বিজ্ঞান প্রকাশ করতে পারবে? এখন পর্যন্ত তো তা করতে পারেনি। সুদূর ভবিষ্যতেও তা পারবে—এমন কোন সম্ভাবনাই নেই। আর দু'চার শতাব্দীতে এ যোগ্যতা অর্জিত হয়ে গেলেও সেই সময় পর্যন্ত মানবতার পুনর্গঠনের কাজ কি অসম্ভব হয়ে থাকবে? আর এই অবকাশে মানবতা কি ধ্বংসের দিকে চলে যাবে তীব্র গতিতে? কিংবা তার পূনর্গঠনের জন্য ভিন্নতর কোন পন্থা এখনই অবলম্বন করা হবে?

একটা দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। একটা শয়তান প্রকৃতির মানুষ নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হয়ে একটি নির্দোষ-নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করল। অপর এক ব্যক্তির মনে এই শয়তান লোকটিকে হত্যা করার ইচ্ছা তীব্র হয়ে দেখা দিল। অপর এক ধনশীল ব্যক্তিকে হত্যা করার ইচ্ছা জাগল এক ব্যক্তির মনে, যার ধারণা ছিল, ওলোকটি নিহত হলে তার যাবতীয় ধন-সম্পদ তার (হত্যা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির) করায়ত্ত হবে অতি সহজেই। এ দু'জন লোকের মনেই মানুষ হত্যার প্রবল ইচ্ছা জাগল। বিজ্ঞান এ দু'জনার মনের ইচ্ছাকে এক মানদণ্ডে ওজন করে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে মাত্র। কিন্তু উভয়ের ইচ্ছার মাঝে কোনরূপ পার্থক্য দেখানো তার পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। অথচ গুণগত দিক দিয়ে এ দু'টি ইচ্ছার মাঝে আকাশ-পাতালের পার্থক্য বিদ্যমান। একটি হচ্ছে ভাল চিন্তা, মানবতার কল্যাণের ইচ্ছা। মানবতার উৎকর্ষ ও প্রগতির জন্য অপরিহার্য কাজের ইচ্ছা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে অত্যন্ত খারাপ, মন্দ ও মারাত্মক ইচ্ছা। তা সমাজের স্থিতির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকরও। এ ধরনের ইচ্ছা বা চিন্তাই মানবতাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় অনিবার্যভাবে। ভাল ও মন্দ, গঠনমূলক ও ধ্বংসাত্মক, সুবিচার ও অন্যায়-অবিচার, ঈমানদারী ও বে-ঈমানী, সত্য ও মিথ্যা, হক ও না-হক, মনুষ্যত্ব ও শয়তানী, আল্লাহনুগত্য ও বস্তুপূজা প্রভৃতির মানদণ্ডে যে মৌল পার্থক্য রয়েছে, বিজ্ঞান তার চরমোন্নতির পর্যায়ে পৌছিয়েও তা নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়নি উপরোদ্ধৃত দৃষ্টান্ত থেকে তা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে।

বস্তুবাদী দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের এ ব্যাপারটি খুবই ভাল করেই চিন্তা ও বিবেচনা করা কর্তব্য। বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ ও তৎলব্ধ মতাদর্শকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে মানবতার উন্নতি ও প্রগতির কোন পরিকল্পনাই রচিত হতে পারে না। বস্তুবাদের ভিত্তিতে মানুষের জন্য কোন সুষ্ঠু জীবন বিধান রচনা করা আদৌ সম্ভবপর নয় । তেমন কিছু করতে চাইলে মানবতাকে ধ্বংসের করাল গ্রাসে নিক্ষেপ করা ছাড়া কোন কাজই করা হবে না, তাকে উন্নতি ও প্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়াও সম্ভবপর হবে না, আধুনিক কালের সুস্থ চিন্তার বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত এ কথা অকপটে মেনে নিতে প্রস্তুত। আধুনিক জগত যে সব কঠিনতম বিপদ-মুসীবতের সম্মুখীন এবং বর্তমান মানবতা যে ধ্বংসের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে, তা এসব বস্তুবাদী দার্শনিক-চিন্তাবিদদের এই ভ্রান্ত মতাদর্শেরই ফসল মাত্র। তাঁরা বিজ্ঞানের মতবাদকে বাস্তব ও চূড়ান্ত সত্য

মনে করে তার উপর তর্ক শাস্ত্রীয় যুক্তিজালের একটা ইমারত নির্মাণ করেছে আর মানবীয় সমস্যাবলীর সমাধান সেখান থেকেই গ্রহণ করতে শুরু করেছে। এমনকি মানুষের সৃষ্টি, মানুষের হৃদয়াবেগ, অন্তর্নিহিত ভাবধারা; ঝোঁক-প্রবণতা, প্রকৃতিগত তৎপরতা, সামাজিক ইতিহাস, নৈতিক অবস্থা, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয়াদি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতি প্রভৃতি সবকিছুই টেনে-হিঁচড়ে সেই ইমারতের মধ্যে নিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে।

বিজ্ঞানীরা নিজেরা তাদের গড়া মতাদর্শকে ক্ষণস্থায়ী বলে মনে করেছে। তাই নিত্য-নতুন পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ ও যাচাই-পরখের মাধ্যমে সেসব মতাদর্শের রদ-বদল ও পরিবর্তন-সংশোধনের কাজে তারা সদা ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু অন্যরা যারা নিজেরা বৈজ্ঞানিক নয় তারা বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে নিছক কাল্পনিক পরিমণ্ডলে থেকে তর্কশাস্ত্রীয় যুক্তি-আদি প্রয়োগ করে এসব মতাদর্শকে প্রাকৃতিক নিয়ম-বিধির মতই অবিকল অপরিবর্তনীয় ও শাশ্বত মনে করে নিয়েছে। এটা যেমন বিস্ময়কর ব্যাপার, তেমনি খুবই হাস্যকরও বটে। আসলে এসব লোকের সাথে বাস্তব জগতের কোন সম্পর্ক নেই। এরা আসলেই নয় বাস্তবতাবাদী লোক। বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ লব্ধ তত্ত্ব ও তথ্যাদিকে ভিত্তি করে জীবন-সমস্যার সমাধান বের করাই এদের অবসর বিনোদনের একমাত্র ব্যস্ততা। আর তাদের দাবি হচ্ছে, বিশ্বলোক ও মানুষের জীবনের উপর প্রকৃত ও বিবেক-বুদ্ধি সম্মত দৃষ্টি কেবল তাদেরই রয়েছে। তাদের এ সব দাবি শুনে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই চরম লাঞ্ছনা, অবমাননা ও অপদস্থ অবস্থা দেখে সুস্থ বিবেক ও সুরুচিসম্পন্ন মানুষদের লজ্জায় মাথা নত করে দেয়া ছাড়া কোনই উপায় থাকে না।

বিজ্ঞান ও জীবন বিধান

ল্যাটিন ভাষায় যে শব্দের অর্থ 'জানা', 'সাইয়েন্স' (science) তা থেকেই গৃহীত। কিন্তু তার ব্যবহার হয় বিশেষভাবে জ্ঞানের সেসব বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে, যা 'বস্তুর' বিচিত্র দিক ও বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে এক সুসংগঠিত ও পরস্পর সম্পৃক্ত তত্ত্ব ও তথ্যের ধারক এবং যা দীর্ঘকালের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ-নিরীক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত তত্ত্ব ও নিয়ম-নীতির সমন্বয়ে সুসংবদ্ধ।

মানুষ তার জন্মমুহূর্তে থেকেই প্রকৃতির নানাবিধ ও বিচিত্র বাহ্য প্রকাশের (natural phenomenon) সাক্ষাৎ পেয়েছে। সে দুনিয়ায় এসেছিল এক অনুসন্ধিৎসু মন-মগজ লয়ে। সে তার চারপাশে যা কিছু দেখতে পেয়েছে, তা আরও সূক্ষ্ম—আরও গভীর ও ব্যাপকভাবে জানতে এবং তা থেকে জীবনে উপকৃত হতে চেষ্টা করেছে। তাতে যথেষ্ট সফলতাও লাভ করেছে সে। বস্তুত তা-ই ছিল তার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ। এ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণে সে যেসব তত্ত্ব ও তথ্য লাভ করেছে তা সে নিজের মগজে সঞ্চিত ও সুরক্ষিত করে রেখেছে। এ পুঞ্জীভূত জ্ঞান-তথ্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনা শুরু করেছে এবং তার ফলে কিছু সিদ্ধান্তও সে গ্রহণ করেছে। এই ভাবে মানুষ তার নিকটবর্তী পরিবেশ থেকে তার প্রয়োজন পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

মানুষ জীবনে বেঁচে থাকার জন্য তীব্রভাবে প্রয়োজন অনুভব করে তার খাদ্যের। নিকটবর্তী পরিবেশ থেকে যতটা খাদ্য অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভবপর ছিল, তা ছিল গাছের পত্র পল্লব, মূল, শিকড়, ফল ও ফুল। সে এর প্রতিটি জিনিস খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে যাচাই করে দেখেছে। তন্মধ্যে সে কতিপয় বিশেষ ফল থেকে অধিক উপকৃত হয়েছে। ফলে সে উপকারী ও ক্ষতিকর উদ্ভিজ্জ জিনিসের মধ্যে পার্থক্য বোধ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। উপকারী দ্রব্যাদির ব্যবহার সে অব্যাহতভাবে চালিয়ে গেল আর ক্ষতিকর দ্রব্যাদির ব্যবহার করল পরিহার। কিছুদিনের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতায় সে ফল দানকারী গাছ-ঘাছালির

জন্মপদ্ধতি জানতে পারল। ফলে বীজের সাহায্যে সে সেসব গাছ-গাছালির উৎপাদন করতে শুরু করে দিল। ক্রমে ক্রমে কাজে আসা গাছ-গাছালির নতুন বংশ উৎপাদন করার বিভিন্ন পন্থা ও পদ্ধতি আয়ত্ত করে নিল।

মানুষের দ্বিতীয় প্রয়োজন ছিল দেহ আচ্ছাদিত করার এবং রোদ ও বৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচাবার। সে গাছের পত্র-পল্লব, বাকল ও কাষ্ঠ দিয়ে এ প্রয়োজন পূরনের ব্যবস্থা করে নিল। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কর্মগত বিজ্ঞান (practical science)-এর সূচনা এমনিভাবেই হয়েছে। এক কালের লোকদের এ বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কর্মগত বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত হল পরবর্তী বংশধররা। ফলে বংশানুক্রমিকভাবে কর্মতৎপরতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের ধারা চলতে থাকল, কালের অগ্রগতির সাথে সাথে নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ ঘটতে লাগল! আর পূর্বকালীন অভিজ্ঞতার ফলাফল আরও পাকা-পোখত হতে লাগল। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমন একটা সময়ও এল, যখন মানুষ কাজের সুবিধার্থে হাতিয়ারের প্রয়োজন অনুভব করল। তীর, বল্লম, ধনুক ইত্যাদি হাতিয়ারের ব্যবহার শুরু হওয়ার মূলে এই তত্ত্ব নিহিত। এককালের তৈরী করা হাতিয়ার দিয়ে মানুষ তৈরী করতে লাগল আরও নতুন নতুন ধরনের হাতিয়ার, যা পরবর্তী বহু দিন পর্যন্ত ব্যবহৃত হতে থাকল।

বাস্তব পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ, লক্ষণ-নিদর্শন ও হাতিয়ারের সাহায্যে প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশ ও দ্রব্যগুণ সম্পর্কিত অনেক তত্ত্ব ও তথ্যই মানুষ লাভ করতে থাকল। মানব-চেতনা বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা বিকাশ লাভ করেছিল বলে সে তত্ত্ব ও তথ্যসমূহকে পারস্পরিক সামঞ্জস্যের ও সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করে নিল। এ প্রচেষ্টা ও কার্যক্রমের ফলে বর্তমান বিজ্ঞানের বিকশিত ও বিবর্তিত রূপ লাভ করা সম্ভবপর হয়েছে। এ কালের বিজ্ঞান বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত। যথা—প্রকৃতি বিজ্ঞান, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞান প্রভৃতি। বস্তুত বিজ্ঞানের সুসংকলন ও বিভাগ ভিত্তিক বিভক্তির ফলেই বিজ্ঞান উন্নতি ও বিকাশ লাভ করে বর্তমান পর্যায় পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে আরব মুসলিম বিজ্ঞানীদের কর্তৃকই বিজ্ঞানের এই বিভিন্ন ভাগে বিভক্তি কার্য সম্পাদিত হয়েছিল। তার পূর্বে

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন দেশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছিল। সংশ্লিষ্ট দেশের লোকেরাও সে বিষয়ে কিছু মাত্র অবহিত ছিল না। কোন গুরুত্বও তারা দিত না তার প্রতি। আরব দেশকে কেন্দ্র করে যখন ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র বিপ্লব সংঘটিত হল এবং ইসলামের শিক্ষা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রগতি লাভ করার জন্যে মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করল, তখন মুসলমানরা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকা জ্ঞান-তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করলেন এবং সে বিষয়ে তাঁরা বহু সংখ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করলেন। এই সব কিছুকে একত্র করে তাঁরা আরও উন্নতমানে পরীক্ষা ও যাচাই-পরখ শুরু করে দিলেন। রীতিমত গবেষণাগার ও পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হল ইউরোপে সর্বপ্রথম গবেষণাগার ও পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ কেন্দ্রে রীতিমত পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের কাজ মুসলিম বিজ্ঞানীদের কর্তৃক স্পেনে শুরু হয়েছিল। বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকা এ অধ্যায়ের কথা স্বয়ং ইউরোপই বেমালুম ভুলে যেতে চেয়েছে এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত সমস্ত অবদানই কেবলমাত্র ইউরোপীয়দের বলে দাবি করা হচ্ছে অতীব নির্লজ্জতা সহকারে। কিন্তু ন্যায়বাদী কোন লোকই বিজ্ঞানে একক ও মৌলিক মুসলিম অবদানকে অস্বীকার করতে পারে না। (A history of science by Dampier দ্রষ্টব্য)

মানুষ যেসব যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার-অস্ত্র নির্মাণ করেছে, তা প্রায় সব-ই লৌহ থেকে। আজ পর্যন্ত তারই ব্যবহার চলছে। লোহা আবিষ্কার ও যে কালে লৌহ আবিষ্কৃত হয় সে কালের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, আজ পর্যন্তকার সমস্ত আবিষ্কার উদ্ভাবনের মধ্যে তা ছিল সত্যিই একটা বড় বিস্ময়কর ব্যাপার। এটম, আণবিক শক্তি, রকেট ও মহাশূন্যের অভিযান—প্রভৃতির তুলনায় তা কোন দিক দিয়ে সামান্য ছিল না। মানুষ লোহা সম্পর্কে কিছুই জানত না। তার অণুগলি বিভিন্ন সংমিশ্রনের রূপে মাটির গভীর তলায় বিভিন্ন চত্বরের পরতে পরতে প্রস্তরের সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছিল। মানুষ তা তালাস করে করে একত্রিত করে এবং তা নিরেট লৌহের শক্ত জমাট বাধা রূপে রূপান্তরিত করে। তারা প্রথমে মাটি বা প্রস্তরের সেসব অণুকে একত্রিত করে থাকবে, যাতে লৌহের সংমিশ্রণ ছিল বলে মনে করা হয়েছিল। পরে তাকে গরম করে নিয়ে লৌহকে আলাদা বের করে নিয়েছে। এভাবেই লৌহের গলিত ধাতু লাভ করা সম্ভবপর হয়েছে কিন্তু প্রশ্ন হল সেই মাটি বা

প্রস্তরে যখন লৌহের কোন চিহ্নও দেখা যায়নি, তখন তারা কি করে জানতে পারল যে, মাটি বা প্রস্তুরের এ সব অণুর সাথে লৌহের ন্যায় এত শক্ত অণু মওজুদ রয়েছে? সেসর মাটি বা প্রস্তরের অণুগুলোকে সামান্য গরম করেই যে গলিত লৌহ বের করা গেছে, তা-ও তো নয়। সেজন্য খুব বেশী উত্তপ্ত করতে হয়েছে, তার পরই হয়ত লৌহ আলাদা করা সম্ভব হয়েছে। সামান্য মাত্রায় উত্তপ্ত করলেই যদি লৌহের গলিত ধাতু বের হয়ে থাকত, তাহলে না হয় মনে করা যেত যে সে গলিত লৌহ হয়ত সহজেই জমে শক্ত ধাতুতে পরিণত হতে লোকেরা দেখতে পেয়েছিল বলে তাতে তেমন কোন প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বা মেধার প্রয়োজন হয়নি এবং লৌহ উৎপাদন খুব সহজেই সম্পাদিত হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তো তা নয়। সে যাই হোক, এই সমস্ত সম্ভাবনাকে সামনে রেখে বিবেচনা করলে স্পষ্ট মনে হয়, সেকালে লৌহের আবিষ্কারে তুলনায় আজকের দিনের আণবিক শক্তি আবিষ্কার কিছুমাত্র কঠিন ও দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। বস্তুবাদী দুনিয়ার আবিষ্কৃত আণবিক শক্তির আবিষ্কার লয়ে এতটা গৌরব করার মূলে কোন সারবত্তার সন্ধান মেলে না। এ গৌরব নিতান্তই অন্তঃসারশূন্য ও হাস্যকর মনে হয়।

শুধু লৌহের ব্যাপারই নয়। এই ধরনের আরও যত আবিষ্কার উদ্ভাবনী এ পর্যন্ত দুনিয়ায় সাধিত হয়েছে, সেই সব কয়টি বিষয়েই এই প্রচণ্ড প্রশ্ন দেখা দেয়—এ সব আবিষ্কারের দিকে মানব মন কিভাবে আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ হয়ে ছিল? পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ পর্যায়ে মানুষের মনকে কোন্ শক্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছে দেয়, সেখানে পৌছে সে এক মহাকল্যাণকর ও অভাবিতপূর্ব কর্মোপযোগী তত্ত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়? এ ব্যাপারের সমস্ত দিক সম্পর্কে চিন্তা-বিবেচনা করলে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছাড়া মানুষের গত্যন্তর থাকে না যে, বিশ্বলোকের যেসব জিনিসের সহিত মানব জীবনের কোন-না-কোন সম্পর্ক রয়েছে, সেই সমস্ত বিষয়ে প্রয়োজন পরিমাণ জ্ঞান-তথ্য মানুষের অবচেতনায় (pro-conscious mind) পূর্ব থেকেই বর্তমান ও মওজুদ হয়েছিল। মানুষ যখন একটা বিশেষ পরিবেশ বা বিশেষ ধরনের অবস্থায় নিপতিত হয়, তখন তার মগজে অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হয়ে উঠে। আর তার অবচেতনায় পূর্ব থেকে জমে থাকা জ্ঞান-তথ্য একের পর এক চেতনার পটে ভেসে উঠতে শুরু করে। এই ভাবেই মানুষ এক-একটা নতুন কথা জানতে পারে—নতুন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। ফলে তা

আসলে নতুন কিছু হয় না: বরং তা অনেক পুরাতন। পূর্ব থেকেই তার মনের গোপন কুঠরিতে জমা হয়ে তালাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। কাজেই একে আবিষ্কার বা নবোদ্ভাবন বলা চলে না, বড়জোর একে 'নতুন করে সন্ধান লাভ' নামে অভিহিত করা যায়। অন্য কথায়, মানুষের মন-মগজ হচ্ছে বিশ্বলোকের সমস্ত অংশ—প্রস্তর, উদ্ভিদ, জন্তু-জানোয়ার ও উর্ধ্বলোক—সম্পর্কিত জরুরী ও প্রয়োজন পরিমাণ জ্ঞানের গুদাম ঘর বিশেষ। তা প্রতিটি মানুষই বংশানুক্রমে লাভ করে থাকে। মানুষ যখন বিশেষ কোন পরিবেশ-পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং অপরিহার্য প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন তার মনে অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হয়। তার ফলে 'গুদাম ঘরে' রক্ষিত জ্ঞান-তথ্য ও তত্ত্ব অজ্ঞানতার আড়াল দীর্ণ করে জ্ঞানে সমুদ্ভাসিত প্রেক্ষাপটে এক অভিনব আবিষ্কারের রূপ পরিগ্রহ করে ভেসে উঠে। সমস্ত মানুষের মগজ সেই সব জ্ঞান-তথ্যে আকীর্ণ, যা উন্মেষ ও বিকাশ লাভের উপযোগী পরিবেশ ও পরিমণ্ডল না পাওয়া পর্যন্ত গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে থাকে। কথাটি এভাবেও বলা যায়, কারোর কোন কথা জানতে পারার অর্থ, মগজ-সংস্থার কোন বিশেষ অংশে একটি বিশেষ পরিবেশ-পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার দরুন অবচেতনা থেকে সচেতনতায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠা। আধুনিক কালীন সমস্ত আবিষ্কার উদ্ভাবন ও সমস্ত নবলব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করলে প্রতিটি আবিষ্কারেরই কেবলমাত্র এই ব্যাখ্যাই দেয়া যেতে পারে। মানুষের জ্ঞানের উৎস ও উপাদানের খোঁজ করা হলেও এই তত্ত্বই লাভ করা যায়। বস্তুত মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মতবাদ-মতাদর্শের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও এছাড়া আর কিছু নয়।

মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপায় ও উপকরণ-উপাদান সম্পর্কে দার্শনিকগণ যত মতবাদ-মতাদর্শ রচনা করেছেন, তার মধ্যে কোন একটি মতবাদও এতটা পূর্ণাঙ্গ নয়, যা এ সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়াদি ও সমস্যাদির সান্ত্বনাদায়ক সমাধান পেশ করতে পারে। অবশ্য কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র কালামই এ পর্যায়ে আমাদের নির্ভুল পথ প্রদর্শন করতে সক্ষম। কুরআন অধ্যয়নে আমরা জানতে পারি, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ) কে দুনিয়ায় প্রেরণের পূর্বে বিশ্বলোকের সমস্ত মানব জীবন সংক্রান্ত দ্রব্যাদির সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান দান করেছিলেন। সম্ভবত এই কারণেই কুরআন মজীদের আল্লাহ তা'আলা বারবার মানুষকে বলেছে ঃ "চিন্তা বিবেচনা করে গবেষণা ও গভীর অনুসন্ধিৎসা চালাও।" অর্থাৎ নিজেদের মন ও

মগজকে এমন অবস্থায় নিয়ে আস, যে অবস্থায় পৌছে আল্লাহ্‌র দেয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান তোমাদের চেতনায় জাগ্রত হতে পারে। আর তার সাহায্যে তোমরা তোমাদের স্রষ্টা, মালিক ও লালন-পালনকারীকে চিনতে ও জানতে সক্ষম হবে।” হযরত আদম (আ)-কে দেয়া জ্ঞানের এই ভাণ্ডারের কারণেই তিনি দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র খলীফা ফেরেশতাদের সিজদা প্রাপ্ত ও সেরা সৃষ্টিরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। হযরত আদম (আ) জ্ঞানের এ সঞ্চিত ভাণ্ডার লয়েই দুনিয়ায় তশরীফ এনেছিলেন। মানুষের বাস্তব পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে কথা ও কাজে এই জ্ঞানই প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। বর্তমানে সুসংবদ্ধ রূপে সমুপস্থিত বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার এই হচ্ছে গোড়ার ইতিহাস। অবশ্য এ একটি স্বতন্ত্র বিষয়, যে সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হলেই বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা সম্ভব।

বিজ্ঞানের আবিষ্কার-উদ্ভাবনীর ইতিহাস আলোচনা করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মানুষ বিশ্বলোকের যেসব অংশ ও শক্তি এবং সেসব অংশের সেসব দিক সম্পর্কে তার নিজের ও সামাজিক-সামষ্টিক জীবনের জন্য প্রয়োজন বোধ করে, মানুষ কেবল মাত্র সেই সেই অংশ ও শক্তি এবং কেবল সেই সেই দিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে, ভবিষ্যতেও তাই করতে থাকবে। তা ছাড়া অন্যান্য সব অংশ ও দিক সম্পর্কে মানুষ অজ্ঞই থেকে যায়। বস্তুত প্রয়োজনই হলো মানবীয় জ্ঞানের মৌল প্রেরণাদায়ক কারণ। কিন্তু সমগ্র সৃষ্টিলোকের নিগূঢ় তত্ত্ব কিংবা তার সৃষ্টি, উন্মেষ, সেখানে মানুষের জন্ম, তারপরে সমগ্র সৃষ্টিলোকের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া, পরে আর একটি জগতের অস্তিত্ব লাভ প্রভৃতি বিষয়ে মানুষের মনে-মগজে নানা চিন্তা-কল্পনা বা প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা জেগে ওঠে বটে; কিন্তু এ সব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পূর্ব থেকেই কোন জ্ঞান মানুষের মনে-মগজে রেখে দেন নি। এই কারণে মানুষ এ সব বিষয়ে নিজেদের বাস্তব পরীক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে প্রকৃত কোন তত্ত্ব ও তথ্য লাভ করতে পারে না। চিন্তা-গবেষণা করে তত্ত্ব ও তথ্য উদ্ঘাটনের বিষয়ই এটা নয়। এসব বিষয়ে যা কিছু বলবার ও জানবার, তা আল্লাহ্‌র কালামই বলে দিয়েছে। যে-লোক তার প্রতি পরিপূর্ণ প্রত্যয় স্থাপন করবে, সে পরম নিশ্চিন্ততা ও আশ্বস্তি লাভ করবে। আর যে লোক তা প্রত্যাখ্যান করবে, সে সারা জীবন আঘাতের পর আঘাত খেতে থাকবে। বিশ্বলোক সম্পর্কে, মানুষের জীবন সম্পর্কে, মানুষের নৈতিকতা, অধ্যাত্ম সম্পর্কে

সে মানসিক আশ্বস্তি ও সান্ত্বনা কিছু মাত্র লাভ করতে পারবে না। এগুলো এবং এ পর্যায়ের অন্যান্য গায়বী বিষয়াদি সম্পর্কেই বস্তুবাদী দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা কাল্পনিক ধারণা ও প্রকল্প দাঁড় করতে থাকে। আর কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাতে নিয়ে আসে নানা রকমের পরিবর্তন। এই কারণে এসব বিষয়ে তাদের মনে-মগজে একটা অস্থিরতামূলক অবস্থা সব সময়ই বিরাজ করতে থাকে। পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ততা লাভ করা যায় যে-পথে, সে পথের কোন সন্ধান পাওয়া তাদের ভাগ্যে কখন-ই জুটে না। মানব জীবনের চূড়ান্ত মনজিল—পরকালীন জান্নাতী জীবনের দিকে তারা ফিরতে ও মুখ করে চলতে পারবে না কখনই। এই মনজিলের দিকে একটি মাত্র পথ-ই চলে গেছে। সে পথটিতে কেবল সে পথিকই চলতে পারে, গায়বী জগতের মহাসত্যের প্রতি যাদের মনে বিশ্বাসের চূড়ান্ত আশ্বস্তি কায়েম হয়েছে। যাদের মনে বিন্দুমাত্রও অস্থিরতা ও বিশ্বাসের বিচলতা রয়েছে, তারা সফলতা সহকারে পরকালের পথে অগ্রসর হতে পারবে না। পরকালীন জান্নাতী জীবন লাভ করাও তাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না। এরূপ অবস্থাকেই কুরআন মজীদে 'ঈমানের দুর্বলতা' বলে অভিহিত করা হয়েছে। গায়বী জগত সংক্রান্ত জ্ঞানের চূড়ান্ত উৎস এই সিদ্ধান্তই ঘোষণা করেছে।

বিজ্ঞানের লক্ষ্য

বিশ্বলোকের অংশসমূহের এমন বহু দিক রয়েছে, যে সম্পর্কে মানুষ কোন কিছুই জানতে পারে না। আর যদি জানতে পারেও তবু তা যেহেতু কোন অংশ সম্পর্কেই সম্যক ও সর্বব্যাপক (all inclusive) জ্ঞান হতে পারে না, একটি দৃষ্টিপাতে তাঁর সমগ্র দিক সমমানের ও আনুপাতিক সুসমতা সহকারে দেখা কখনই সম্ভবপর হতে পারে না। এই কারণে মানুষ সে অংশের সমগ্র সত্য ও সমগ্র সত্তার সহিত কখনই পরিচিত হতে পারে না। কেননা তার একটি দিকের সাথে অন্য দিকের, দ্বিতীয় দিকের সাথে তৃতীয় দিকের এবং তৃতীয় দিকের সাথে সমগ্র সত্তার (whole) যে সম্পর্ক তা একটি মাত্র দৃষ্টিপাতে কখনই আয়ত্তে আসতে পারে না। এই কারণে বিজ্ঞানকে বিশ্বলোক সম্পর্কিত চূড়ান্ত ও প্রকৃত সত্যকে জানবার উপায় বা মাধ্যম মনে করা সাধারণত যেমন করা হচ্ছে—সম্পূর্ণ ভুল ও নিতান্তই নির্বুদ্ধিতামূলক কাজ। বিশ্বলোকের নিগূঢ় সত্য ও তত্ত্ব উদ্ঘাটন ও প্রকাশ করা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য আদপেই নয়। তবে বিজ্ঞানের সাহায্যে যতটা করা সম্ভব তা হলো—কোন ঘটনা বা প্রকৃতির বাহ্য প্রকাশের (natural

phenomenon) নিকট ভবিষ্যতের ফলাফল—তা সংঘটিত ও প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই জানা যায়। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ তা বলে দিতে পারে। কোন ঘটনা বা প্রকৃতির বাহ্য প্রকাশকে যথাসম্ভব বিস্তারিত করে উন্মুক্ত করে দিতে এবং তার এক একটি অংশের পারস্পরিক সম্পর্কের জন্য জরুরী নিয়ম-বিধান রচনা করতে বিজ্ঞান সক্ষম। ফলে এভাবে যে অধ্যয়ন ও গবেষণা চালাবে সে তা থেকে কি জিনিস হতে যাচ্ছে, তা বলে দিতে পারবে। যেমন, আকাশ মণ্ডলে অবস্থিত গ্রহ-উপগ্রহের পারস্পরিক সম্পর্ক ও গতিশীলতা বছরের পর বছর ধরে করা অধ্যয়ন-পর্যবেক্ষণের পর যেসব নিয়ম-কানুন তৈরী করা হয়েছে, তারই ভিত্তিতে বর্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। এ সবের সাহায্যে একজন জ্যোতির্বিদ বলতে পারে যে, আজ থেকে কয়েক বছর পর অমুক গ্রহটি অমুক স্থানে অমুক ধরনের অবস্থায় থাকবে। তার ফলে পৃথিবীর উপর কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে তাও সে হয়ত বলতে পারে। কিন্তু আকাশ মণ্ডলে অবস্থিত এই গ্রহ-উপগ্রহসমূহ মূলত কি? যে সব প্রাকৃতিক, রাসায়নিক জৈব বস্তু পৃথিবীর বুকে আমরা সরাসরি পর্যবেক্ষণ করি এবং সেগুলো অনেকটা চিনতেও পারি, সেসবের মধ্যে কোন সব জিনিস এ আকাশমার্গীয় অবয়বসমূহে পাওয়া যায়? আমাদের এই পৃথিবী বা পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্য যেসব মৌল উপাদানে (element) তৈরী, আকাশমার্গীয় অবয়বসমূহেও সে সব উপাদান-উপকরণই পাওয়া যায় কিংবা অন্য কোন উপাদান উপকরণ? পৃথিবী যে বিন্যাসে তৈরী, সেসব অবয়বেও কি সেই বিন্যাসই নিহিত, না অন্য কোন বিন্যাস, অন্য কোন ধরনের সংযোজন সজ্জায়ন? আকাশমণ্ডলে যেসব অবয়ব উজ্জ্বল সমুদ্ভাসিত এবং যা থেকে আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয়, সেই আলোকচ্ছটা সেসবের নিজস্ব হোক কিংবা সেসবের উপর প্রতিফলনশীল—যেমন সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি—কিছুটা পরিমাণ বিজ্ঞানের আওতার মধ্যে আসতে পেরেছে এবং সেসবের রাসায়নিক উপাদান সম্পর্কে বর্ণালী পর্যবেক্ষণ বা পরিমাপ যন্ত্রের (spectrometer) সাহায্যে কিছুটা অনুমান করা গেছে। আলোকচ্ছটা যখন একটা সদৃশ সমান ও সমান্তরাল বহুভুজ প্রান্তযুক্ত—ত্রিপার্শ্ব কাঁচের মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত হয় তখন প্রত্যেকটি আলোকচ্ছটা লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, নীল, আসমানী ও বেগুনী—এই সপ্তবর্ণে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। এই সাতটি বর্ণের আলোকচ্ছটা কোন পর্দার উপর গ্রহণ করা হলে তা সুবিন্যস্তভাবে পতিত হয়ে সপ্তবর্ণের একটি বর্ণচ্ছটা (spectrum) গড়ে উঠে। বর্ণচ্ছটাটির প্রতিটি রঙ্গীন অংশে কিছু কালো রেখা দৃশ্যমান হয়ে উঠে। এ সবের সংখ্যা ও চাকচিক্য বিভিন্ন জিনিসের তৈরী আলোকের বর্ণচ্ছটায় বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন

হাইড্রোজেন (hydrogen) জ্বললে যে আলোকচ্ছটা ফুটে উঠে, তার বর্ণচ্ছটায় কালো রেখা তারই জন্য নির্দিষ্ট। অনুরূপভাবে প্রত্যেক উপাদানের বর্ণচ্ছটায় যা জ্বলে আলো সৃষ্টি করতে পারে—কালো রেখাগুলির সংখ্যা স্বতন্ত্র হয়। বর্ণালী পরিমাপ যন্ত্রের সাহায্যে সমস্ত উপাদানের বর্ণচ্ছটা বিশ্লেষণ করে কালো রেখাগুলির সংখ্যা জেনে নেয়া সম্ভব হয়েছে। যে নক্ষত্রের বর্ণচ্ছটায় যত সংখ্যক কালো রেখা পাওয়া যায়, সেই অনুপাতে এই নক্ষত্রসমূহের রাসায়নিক উপাদান সম্পর্কে অনুমান হয়ে যায়। সূর্য সম্পর্কে অনুমান করা হয়েছে, তা হাইড্রোজেন গ্যাসের একটা বিরাট বলয়, সর্বক্ষণ ধিক্‌ধিক্ করে জ্বলমান হয়ে আছে। এটা একটা অনুমান এবং 'চক্‌চক্ করা জিনিস মাত্রই স্বর্ণ নয়' কথাটি এ সম্পর্কে বেশ খাটে। এ হচ্ছে বিজ্ঞানীদের অনুমান মাত্র। আর সোডিয়ামের বর্ণালীতে যতগুলো কালো রেখা আছে, এসব নক্ষত্রের বর্ণালীতেও অনুরূপ সংখ্যক কালো রেখা হবে—এটাও একটা অনুমানই মাত্র। কাজেই বলা হয়, অমুক নক্ষত্রটি সোডিয়ামের তৈরী। দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে খুব বেশী হলেও শুধু এটুকুই বলা যায় যে, অমুক নক্ষত্রটির বর্ণলীতেও কালো রেখা ততটিই রয়েছে যতটি সোডিয়ামের বর্ণালীতে রয়েছে। এর বেশী কিছু বলা নিতান্তই আন্দাজ-অনুমানের কথা মাত্র। কিন্তু আন্দাজ-অনুমান দ্বারা প্রকৃত সত্য জানতে পারার দাবি করা খুবই মারাত্মক ব্যাপার। তখন 'অল্প বিদ্যা ভয়ংকর' সত্য হয়ে দাঁড়াবে নাকি?

মহাশূন্যে উড্ডয়ন ও অভিযান চালিয়ে মহাশূন্যলোক সম্পর্কে যেসব পরীক্ষণ নিরীক্ষণ চালানো হচ্ছে, তা থেকে যে ফল লাভ করা যাবে, তা আমাদের এতটা যোগ্য বানিয়ে দেবে যে, আমরা চন্দ্র ও বিশেষ বিশেষ তারকার মৌল উপাদান সম্পর্কে অনুমান করতে পারব এবং সেসব উপাদানের সাথে পৃথিবীর মৌল উপাদানের কি সম্পর্ক, সে বিষয়েও ধারণা করা সম্ভব হবে। যেসব প্রাকৃতিক শক্তি এখানে কাজ করছে এবং যে ব্যবস্থার অধীন কাজ করছে, সেই শক্তিসমূহই এই ব্যবস্থাধীন সেখানেও কাজ করছে, না এখানকার ও সেখানকার প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য আছে বলেও অনুমান করা যেতে পারে—এ সব-ই জানা গেলেও, এ সব তত্ত্ব ও তথ্য জ্ঞান দিয়ে আমরা মানুষের সামাজিক ও তামাদ্দুনিক জীবনে কি কোন কল্যাণ লাভ করতে পারি। আমরা কি সেখানে জীবন যাপন উপযোগী পরিবেশ পরিমণ্ডল তৈরী করতে পারি? তা না হলে তো সেখানে জীবন যাপন সম্ভবপর হবে না। আমরা কি এ সব গ্রহ-উপগ্রহ, চন্দ্র ও নক্ষত্রের গতিবেগে কোন পরিবর্তন আনতে পারি? অথচ সেই গতিবেগের প্রত্যক্ষ

প্রভাব পড়ছে পৃথিবীর উপর।...... এ পর্যায়ে এই কয়টি এবং এই ধরনের আরও প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু তা-ও তখন, যখন পূর্বোল্লিখিত সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্য আমাদের আয়ত্তাধীন হবে। অথচ এ সব তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে জানবার জন্যে দীর্ঘ কালের প্রয়োজন। সেই সময় পর্যন্ত এ কাজে যতটা মূলধন নিয়োজিত হবে, বিজ্ঞানীদের যতটা লক্ষ্য ও মেধা-প্রতিভা শক্তি ব্যয়িত হবে, সেই সব-ই যদি এখানে মানুষের প্রয়োজন পূরণে বিনিয়োজিত হয়, তাহলে এমন সব উপায় ও পন্থা আয়ত্তাধীন হতে পারে, যার দ্বারা দুনিয়ার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার আর্থিক ও সামাজিক প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভবপর হতে পারে। বিজ্ঞানের যেসব শাখার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে—যেমন ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব ও জীববিজ্ঞান, এসব কয়টি বিভাগের জ্ঞান এখনও একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে পড়ে রয়েছে। আমেরিকা ও রাশিয়া যতটা মহাশূন্য অভিযান চালাচ্ছে, যতটা জোরে-সোরে রকেট-বিজ্ঞানের চর্চা ও পরিচর্যা করা হচ্ছে, তা চিন্তাশীল লোকদের জন্যে বড়ই চিন্তা ও বিস্ময়ের ব্যাপার! বিজ্ঞানের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এক-একটি রকেট উৎক্ষেপণকালে যে মহোৎসব করা হয়েছে, যেরূপ গৌরবজনক ঘোষণাবলী প্রচার করা হয়েছে, বিজ্ঞানের অন্য কোন আবিষ্কারেই আজ পর্যন্ত তা করা হয়নি। তাহলে 'যে মেঘ বেশী গর্জে, তা বেশী বর্ষে না' বলেই কি ধারণা করতে হবে? এসব রকেট, কৃত্রিম চন্দ্র বা মহাশূন্য স্টেশন থেকে সত্যিকার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য আজ পর্যন্ত তেমন কিছুই পাওয়া যায়নি।

এই পর্যায়ে রকেটের ইতিহাস স্মরণ করা যেতে পারে। ১৯২৭ সন থেকে জার্মানীতে রকেট-বিজ্ঞান ও নির্মাণ কৌশল পর্যায়ে রীতিমত কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তার পূর্বে এ বিজ্ঞানটা ছিল নিতান্ত থিওরিটিক্যাল—তত্ত্বীয় ও ধারণাগত মাত্র। আতশবাজিতে নিক্ষিপ্ত রকেট দেখেই বিজ্ঞানীরা তার বৈজ্ঞানিক সমীক্ষণ চালিয়েছে। প্রথমে মত ও প্রকল্প রচনা করা হয়। এ ক্ষেত্রে রুমানিয়ার Hermann Oberth-এর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৫ সনের মধ্যবর্তীকালে জার্মানীর বোমারু রকেট নির্মিত হয়। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে হিটলার বারবার ঘোষণা করতো যে, তাঁর নিয়োগকৃত বিজ্ঞানীরা এমন সব মারণাস্ত্র নির্মাণে ব্যস্ত রয়েছে যে, তা ব্যবহৃত হলে কয়েক মিনিটের মধ্যে বহুদেশ-মহাদেশ ধ্বংস করে দেয়া যেতে পারে। রকেটের ব্যবহার ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। তা অগ্নিপ্রোজ্জ্বল বোমা লয়ে ইংলন্ডের উপর চালকবিহীন অবস্থায় শব্দের গতির তুলনায় ছয়গুণ বেশী গতিতে উড়ত ও বোমা

নিক্ষেপ করত। এসব রকেটই তো ইংলন্ড নগরী ধ্বংস করে দিয়েছিল। রাশিয়ার মস্কো, লেনিনগ্রাড, স্ট্রালিনগ্রাড প্রভৃতি বড় বড় শিল্প নগরীও বিধ্বস্ত করেছিল। ১৯৩৫ সনে জার্মান বিজ্ঞানী willy Ley (জার্মান রকেট সোসাইটির সংগঠক) আমেরিকায় গিয়ে এই রকেট বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচার করেন। ১৯৫৫ সনের ২৯ শে জুলাই আমেরিকায় একটি বিজ্ঞান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে বড় বড় বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, আমেরিকা ১৯৫৫ সনের শেষে কিংবা ১৯৫৮ সনের শুরুতে একটি কৃত্রিম চাঁদ মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করবে। এই বছরটি 'আন্তর্জাতিক ভূ-প্রাকৃতিক বছর (internatoinal geophysical year) রূপে নির্দিষ্ট করা হয়। এ বছরটি হল ১৯৫৭ সনের ১লা জুলাই থেকে ১৯৫৮ সনের ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত। মহাশূন্যের এসব অভিযানের মূলে এসব বড় বড় রাষ্ট্রের কি উদ্দেশ্য, তা তারাই জানে। তবে আমরা বলতে পারি, এসব অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল যদি দুনিয়ার সামনে প্রকাশ করা হয়, তাহলে এক মহাশক্তিমান আল্লাহ্র প্রতি ঈমান দুর্বল ও নড়বড়ে হওয়ার পরিবর্তে আরও সুদৃঢ় ও অবিচল হয়ে উঠবে। দুনিয়ার নাস্তিক বিজ্ঞানীরা হয়ত জানে না, আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের বিশেষত্বই হচ্ছে এই যে, বিশ্বলোকের ঘুমন্ত নিগূঢ়-নিহিত প্রচ্ছন্ন তত্ত্বসমূহ ক্রমে ক্রমে যতই উদ্ঘাটিত হতে থাকবে, সেই ঈমানে সেই অনুপাতে দৃঢ়তা ও অবিচলতা আসতে থাকবে। কেননা বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করায় ঈমানদার লোকদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে, একথা তো কুরআনেরই ঘোষণা।

এ হলো খগোল তত্ত্ব পর্যায়ে বিজ্ঞানের অবদানের কথা। প্রকৃতি বিজ্ঞান ও রসায়নবিদ্যা বস্তুর বিভিন্ন অবস্থা ও অণুসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের যে সব নিয়ম-বিধি জানতে পেরেছে, সেসবের সাহায্যে আমরা কোন-না-কোন প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক বাহ্য প্রকাশের পর্যবেক্ষণ করে তার ফলাফল সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। আর বলতে পারি যে, অমুক-অমুক উপাদান এই এই অনুপাতে সংমিশ্রণ করা হলে অমুক যৌগিক (compound) তৈরী হবে কিংবা অমুক জিনিসটি এত মাত্রার তাপ পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হলে তা অমুক অবস্থায় পরিণত ও রূপান্তরিত হবে।

বিজ্ঞানলব্ধ এসব তত্ত্ব ও তথ্যের একটা বড় অবদান হল তা মানুষের মন থেকে কুসংস্কার ও প্রকৃতি-পূজার প্রবণতা দূর করে দিয়েছে। তার পূর্বে মানুষ যে কোন পার্থিব বা আকাশমার্গীয় অবয়ব অথবা প্রকৃতির বাহ্য প্রকাশে বিস্ময়

উদ্দীপক কিছু দেখতে পেত, তখন-তখনই তার সামনে বিনয়াধিক্যের চাপে প্রণত হতো। তার ভয় ও আতংক তার হৃদয়-মনে এমন শক্তভাবে বসে যেত যে, সে তার পূজা শুরু করে দিত। তাকে মা'বুদ বানাতেও দ্বিধাবোধ করত না। বিজ্ঞানের আবিষ্কার উদ্ভাবন এ সব নিষ্প্রাণ মূর্তিকে মানুষের 'খোদা নয়—মানুষের সেবক প্রমাণ করে দিয়েছে।

কিন্তু বিজ্ঞানের তত্ত্ব, মতাদর্শ-ও নিয়ম-নীতির প্রতি মানুষের নিরংকুশ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপিত হতে পারে না। কেননা এগুলো মানুষের নিজেদের গড়া তত্ত্ব বা মতবাদ ও নিয়ম-নীতি। আর তা পঞ্চেন্দ্রিয় অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এগুলো মানুষের চেতনার ধারাবাহিকতা ও আনুপাতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে নিছক কল্পনা ও ধারণা-অনুমানের ভিত্তিতে রচিত। তা প্রকৃত নিয়ম-বিধির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হতেও পারে, না-ও হতে পারে। মানব মস্তিষ্ক প্রসূত এ সব প্রাকৃতিক আইন (natural laws) যে প্রকৃত, যথার্থ ও নিঃসন্দেহ, তা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। বিশেষত তা নিত্য পরিবর্তনশীল। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এসব মতবাদের কতবার যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই।

বৈজ্ঞানিক নিয়ম-বিধি এবং তত্ত্ব ও তথ্য

বিশ্বপ্রকৃতির বাহ্য প্রকাশে যে সুসংবদ্ধতা, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও বিন্যাস রয়েছে, বারবার অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সেসবের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। এ পর্যায়ে আমাদের রচিত নিয়ম ও পদ্ধতির প্রতি আমাদের পরিপূর্ণ আস্থার প্রকাশ হয় আমাদের ব্যবহৃত ভাষায়। এসব নিয়ম প্রণালী থেকে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়ের প্রকাশ ঘটে। একই প্রকার দৃশ্য দেখে সব মানুষ একই কথা বুঝতে পারে। অবশ্য যদি কারোর উপর কোন অস্বাভাবিক অবস্থার প্রতিপত্তি না ঘটে।

বারে বারের অভিজ্ঞতা-পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যাবেক্ষণের ফলে আমরা যখন জানতে পারলাম যে, বিশেষ ধরনের একটা অবস্থার সৃষ্টি হওয়ার ফলে বিশেষ ধরনের একটা প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশ (phenomenon) সংঘটিত হয়—এসব অবস্থার সাথে কারণ ও কার্যের সম্পর্কে একটা বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয়—তখন আমাদের এসব পর্যবেক্ষণকে এমন সব শব্দে শ্রেণীবদ্ধ করে মানসপট ও লেখনীর সাহায্যে সংরক্ষিত করে নিলাম যে, যখনই আমরা এসব অবস্থা অনুভব করব, তখনই অনতিবিলম্বে আমাদের মন ও মানস সেই বিশেষ প্রাকৃতিক বাহ্য

প্রকাশের দিকে উন্মুখ হয়ে যায় এবং আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় অর্জিত হয় যে, অমুক অবস্থা খুব শীঘ্রই দেখা দেবে। যেমন, আমরা দেখতে পাই, যখন কোন কঠিন-ঘন-শক্ত জিনিস (solid) শূন্যলোকে (vacuum) ওপর থেকে মাটিতে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন তা হালকা হোক কি ভারী, সব সময় একই গতিতে মাটিতে নিপতিত হয়। কিন্তু এই জিনিসটিই যখন বাতাসে মাটির উপর ঊর্ধ্বদেশ থেকে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন তার নিপতিত হওয়ার গতিতে জিনিসটির হালকা হওয়া বা ভারী হওয়ার কারণে পার্থক্য হবে। ভারী জিনিসটির নিপতিত হওয়ার গতি হবে তীব্র। আর হালকা জিনিসটির নিপতিত হওয়ার গতি হবে মন্থর—অপেক্ষাকৃত কম। এ পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা দুটি প্রাকৃতিক নিয়ম জানতে পারি। একটি হল, প্রত্যেক হালকা বা ভারী শক্ত-নিরেট জিনিস শূন্যলোকে একই গতিতে নিপতিত হয়। আর দ্বিতীয়টি হল বাতাস সে জিনিসটির নিপতিত হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। আর একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাক। একটা বিশেষ ব্যাস সম্পন্ন বাতাসের ওপর যখন এতটা চাপ সৃষ্টি করা হয়, যার ফলে তার ব্যাস অর্ধেক হয়ে যাবে, তখন সেই বাতাসের চাপ পূর্বাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। এটা প্রকৃতির একটা বাহ্য প্রকাশ। এ থেকে আমরা এই প্রাকৃতিক নিয়ম জানতে পারি যে, বাতাসের ব্যাস ও তার চাপের মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ ব্যাস যে হারে কম হয়ে যাবে, সেই অনুপাতে তার চাপ বৃদ্ধি পাবে।

মিঃ রবার্ট বয়েল (Robert Boyle) পরীক্ষণ-নিরীক্ষণের ফলে এ প্রাকৃতিক নিয়মটি জানতে পেরেছেন। এটিকে বলা হয় Boyle's Laws(বয়েলের আবিষ্কৃত নিয়ম)। আমাদের বৈজ্ঞানিক প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর চিরকাল ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিরচিত হয়। ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষণ সর্বদাই হতে থাকে। বারবার পর্যবেক্ষণ করার পর বৈজ্ঞানিকগণ নিজেদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন। ফলে তা-ই 'প্রাকৃতিক আইন' বা নিয়ম বলে অভিহিত হয়। কিন্তু পূর্বে যেমন বলেছি, একই জিনিস বা প্রকৃতির বাহ্য প্রকাশের পর্যবেক্ষণ, পর্যবেক্ষণের মানদণ্ডের বিভিন্নতার ফলে বিভিন্ন ফল সৃষ্টি করে। তার কারণেই বৈজ্ঞানিকদের প্রতিক্রিয়াও বিভিন্ন হতে বাধ্য। অর্থাৎ একই প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশের পর্যবেক্ষণ এক ধরনের পর্যবেক্ষণ মানদন্ড ভিত্তিতে যে প্রতিক্রিয়া বৈজ্ঞানিকদের মানস লোকে জাগিয়ে দেয়, অন্য প্রকারের মানদণ্ডে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ফলে পর্যবেক্ষণ মানদণ্ডের বদলে যাওয়ার কারণে

বৈজ্ঞানিকদের মানসিক প্রতিক্রিয়াও বদলে যায়। অন্য কথায় বলা যায়, পর্যবেক্ষণ মানদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়ম-আইনও পরিবর্তিত হয়ে যায়। একটা দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

লোকেরা সাধারণভাবে দেখে আসছে, কোন জিনিস যখন জ্বলে তখন জ্বলে গিয়ে তা হয় সম্পূর্ণ নিঃশেষ ও অদৃশ্য হয়ে যায়, নতুবা তার পরিমাণ হ্রাস পায়। এ সাধারণ পর্যবেক্ষণের ফলে লোকদের মন-মানসে একটা সাধারণ ধারণা বা প্রতিক্রিয়া জন্মেছে। আর তা হলো ঃ জিনিসগুলো জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যায়। এটা একটা প্রাকৃতিক নিয়মরূপে গণ্য হল। এ নিয়ম থেকে এ সত্যও উপলব্ধি হল যে, বস্তুগত জিনিস ধ্বংসশীল। কিন্তু বারে বারের পর্যবেক্ষণে যখন লক্ষ্য করা গেল যে, জিনিসগুলো যখন জ্বলে, তখন সে জ্বলার ফলে সম্পূর্ণ নতুন জিনিস অস্তিত্ব লাভ করে, যা শূন্যলোকে মিলিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়, যার খুব কম-ই আমরা অনুভব করতে পারি, তখন লোকদের মন এদিকে আকৃষ্ট হল।

একজন বিজ্ঞানী চিন্তা করলেন, জিনিসগুলো জ্বলার ফলে যে দ্বিতীয় জিনিসটি অস্তিত্ব পায়, তাকে শূন্যে মিলিয়ে যাওয়া থেকে রুখ্‌বার কোন পন্থার উদ্ভাবন করতে হবে এবং তা ধরে তার ওজন নিতে হবে। তিনি একটি মোম বাতি দিয়ে এর পরীক্ষণ চালালেন। তিনি একটা বস্তুগত মানদণ্ডের এক পাল্লায় একটি মোমবাতি রাখলেন। আর মোমবাতির ঠিক ওপরে তারের জাল নির্মিত একটা চিম্‌নি ঝুলিয়ে দিলেন। তাতে কস্টিক সোডার কতগুলি টুকরা রেখে দিলেন, যেমন মোমবাতির সঙ্গে সঙ্গে চিম্‌নি ও কস্টিক সোডারও ওজন হতে পারে। এখন তিনি এটার ওজন করে নিলেন আর অপর পাল্লায় অনুরূপ ওজন রেখে পাল্লা সমান করে দিলেন। এরপর তিনি মোমবাতিটা জ্বালালেন। মোমবাতি জ্বালাবার পর থেকেই তিনি জানতে শুরু করলেন যে, মোমবাতির পাল্লাটি নিচের দিকে নুয়ে পড়ছে। পাল্লার ভারসাম্য রক্ষার্থে তাঁকে বারেবারে অপর পাল্লাটিতে ওজন বৃদ্ধি করতে হচ্ছিল। গোটা মোমবাতি জ্বলে যখন শেষ হয়ে গেল, তখন তিনি ওজনের হিসেব করে দেখলেন।

বিজ্ঞানের এ তত্ত্বটি তার ভালভাবে জানা ছিল যে, কোন জিনিস যখন জ্বলে যায়, তখন তা অক্সিজেনের সাথে রাসায়নিক পদ্ধতিতে মিলে গিয়ে একটা রাসায়নিক যৌগিক (compound) বানায়। তাকে বলা হয় অক্সাইড (oxide)। মোমবাতিটি নিজে কার্বন ও হাইড্রোজেনের যৌগিক। তার জ্বলার অর্থ হল কার্বন ও হাইড্রোজেনের অক্সিজেনের সাথে মিলে কার্বন অক্সাইড ও হাইড্রোজেন

অক্সাইড হয়ে যাওয়া। এর মধ্যে একটাকে বলা হয় গ্যাস কার্বন-ডাই-অক্সাইড আর অন্যটি পানির বাষ্প। তার অর্থ এই যে, মোমবাতি জ্বলার পর কার্বন-ডাই-অক্সাইডও পানির বাষ্পে পরিণত ও রূপান্তরিত হয়ে যায়। এ বিজ্ঞানী হিসেব করে জানতে পারলেন, মূল ওজন ততটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যতটা বাতাস থেকে অক্সিজেন বের হয়ে মোমবাতির অংশ কার্বন ও হাইড্রোজেনের সাথে মিশেছে। অবশিষ্ট ওজন ততটাই রয়েছে, যতটা মোমবাতি জ্বলবার পূর্বে ছিল।

এর পরীক্ষণের (experiment) ফলে বিজ্ঞানী জানতে পারলেন ও তাঁর মনে এই বিশ্বাস জন্মিল যে, কোন জিনিস জ্বললে তা নিঃশেষ ও ধ্বংস হয়ে যায় না। তা কেবল মাত্র রূপান্তরিত হয়—নিজের অবস্থা পরিবর্তন করে ভিন্নতর অবস্থায় তা থেকে যায়। অন্য কথায় প্রথমে যদি তা নিরেট শক্ত-ঘন ছিল, তাহলে এখানে তা গ্যাস-অবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। মূল বস্তুর পরিমাণে কোন কম-বেশী হয়নি। এ কারণে জ্বলা পর্যায়ে এ বিধি-নির্ধারিত হল যে, জিনিসগুলো জ্বলে ধ্বংস হয়ে যায় না, ভিন্নতর অবস্থায় পরিবর্তিত হয়। ফলে বৈজ্ঞানিক সত্যও সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল এবং এই সিদ্ধান্ত দাঁড়াল যে, বস্তু অবিনশ্বর। এ কারণে 'বস্তু' পর্যায়ে দুটি পরস্পর বিরোধী বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গড়ে উঠল। আসলে এ 'পরস্পর বিরোধিতা' পর্যবেক্ষণ-মানদণ্ডের বিভিন্নতারই ফল। 'বস্তু' সাধারণ পর্যবেক্ষণে ধ্বংসশীল; কিন্তু রাসায়নিক পর্যবেক্ষণে তা 'অবিনশ্বর' ধরে নেয়া হয়েছে।

এখানেই শেষ নয়। 'বস্তু'র আণবিক পর্যবেক্ষণলব্ধ ফলাফলটাও একবার বিবেচনা ও যাচাই করে দেখা যাক। 'রেডিয়াম' ও 'রেডিয়াম' পর্যায়ের অন্যান্য উপাদান—থোরিয়াম (thorium), ইউরেনিয়াম (urenium) প্রভৃতি সম্পর্কে যে সময় খবর জানা গেল, বিজ্ঞানের জগতে তা এক বিপ্লবের সৃষ্টি করে। সর্বদিকে একটা ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। কেননা বিজ্ঞানের দীর্ঘদিনের—বছরের পর বছর ধরে—বাস্তব পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ-নিরীক্ষণের ফলে 'বস্তু' সম্পর্কে যেসব নিয়ম-বিধি, তত্ত্ব ও তথ্য সুনির্ধারিত হয়ে ছিল, 'রেডিয়াম' আবিষ্কৃত হওয়ার পর তা সবই ভুল প্রমাণিত হয়ে গেছে।

'থোরিয়াম' ও ইউরেনিয়াম প্রভৃতি মৌল উপাদানের 'অণুসমূহ (atoms) চূর্ণ হয়ে হয়ে 'শক্তি'তে (energy) রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সে শক্তি কোথায় লীন হয়ে যায়, তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। 'রেডিয়ামের' এই বিশেষত্ব সম্পর্কে পরীক্ষণ-কার্য পরিচালনার পর অপরাপর মৌল উপাদানেরও আণবিক

পরীক্ষণ চালানো হয়েছে। তাতে যে 'ফল' পাওয়া গেছে, তা হল ঃ 'অণু' (atoms) বিদ্যুৎ ধনাত্মক ইলেক্‌ট্রোন (electrons) ও প্রোটন (protons)-এ চূর্ণ হয়ে ধ্বংস ও বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ ভাবে বস্তু স্থায়ীভাবে প্রতিনিয়ত সম্পূর্ণ অনুভূত পন্থায় 'শক্তি'তে রূপান্তরিত হতে থাকে এবং এ 'শক্তি' অবলুপ্ত হয়ে যেতে থাকে। বস্তুবাদীদের দাবি ঃ 'বস্তু' ধ্বংস হয়নি—'শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে, এবং 'শক্তি' নিঃশেষ ও অবলুপ্ত হয়ে যায়নি; বরং কোথাও পুঞ্জীভূত হতে থাকে। কোথায় তা বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যতে সন্ধান করবে, এ কথা যদি সত্য বলে মেনেও নেয়া যায়, তবুও একথা তো অকাট্যভাবে প্রমাণিতই হয়ে গেছে যে, 'বস্তু'র পরিমাণগত গুণ নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং এ কারণে বিজ্ঞানের যত নিয়ম-নীতি ও সিদ্ধান্ত ছিল সবই শেষ হয়ে গেছে। এ পর্যায়ে বিজ্ঞানীদের স্বতঃস্ফূর্ত ও স্পষ্ট উক্তিসমূহে প্রকৃত সত্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে মনে করা যায় ঃ

স্যার উইলিয়াম সিসিল ড্রাম্‌পিয়ার (Sir William Cecil Drumpier) তাঁর রচিত 'বিজ্ঞানের ইতিহাস' গ্রন্থের ৪৭৮ পৃষ্ঠায় (the evanescence of matter) ('বস্তুর বিলুপ্তি) শিরোনামায় ঊনবিংশ শতক থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্তকার বড় বড় পদার্থবিদ্যা বিশারদদের মতাদর্শ ও তাঁদের পরীক্ষণ আলোকে পর্যালোচনা করে নিম্নোদ্ধৃত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন ঃ

Physical reality is reduced to set of Hamiltonian equations, The old materialism is dead, and even the electrons, which for a time replaced particles of matter, have become but disem. bodied ghosts, more wave forms. They are not even waves in our familiar space, or in Maxwell's aether but in a four dimensionals pace-time or in a scehem of probability, which our minds can not picture in comprehensible terms.

বস্তুগত সত্য হেমিলটন (Hamilton) নামক একজন পদার্থবিদ্যা বিশারদের গাণিতিক সমীকরণের এক দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় পরিবর্তিত হয়ে গেছে। প্রাচীন বস্তুবাদ মরে গেছে এবং ইলেকট্রোনও—যা কিছুকালের জন্য বস্তুগত অণুসমূহের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল—নিছক এক বিদ্রেহী আত্মা ভিন্ন আর কিছু থাকতে পারেনি। 'ইলেক্‌ট্রেন' নিছক একটা প্রবাহের ধারণা দেয় মাত্র। এ প্রবাহসমূহও আমাদের জানা-চেনা শূন্যলোকে উত্থিত প্রবাহ নয়। ম্যাক্‌স ওয়েল (Maxwell) নির্ধারিত ইথারেও তা হয় না। বরং তার চার দিক সম্পন্ন (four dimensional) কাল ও

স্থানে কিংবা এক কাল্পনিকও ধারণাগত প্রকল্পে উত্থিত ও প্রবাহিত হয়, আমাদের মন-মগজ বোধমগ্য পরিভাষায় তার ধারণাও করতে পারে না। লেনিন তাঁর Materialism and Empirio Criticism গ্রন্থের ২৬০ পৃষ্ঠায় The crisis in Modern Physics শিরোনামায় একজন ফরাসী বিজ্ঞানীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন ঃ

রেডিয়াম—যা একটা বিরাট বিপ্লবাত্মক মর্যাদাসম্পন্ন মৌল উপাদান ছিল—শক্তি'র চিরস্থায়িত্বের নিয়মটিকে মূলোৎপাটিত করে দিচ্ছে, সংকটজনক অবস্থা কেবল এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। অন্যান্য নিয়মাদিও অনুরূপভাবে সংকটজনক অবস্থায় পড়ে গেছে। যেমন পরিমিতির স্থায়িত্বের নিয়ম তো পূর্বেই বস্তুর আণবিক তত্ত্বের সাহায্যে মূলোৎপাটিত করা হয়ে গেছে।

উক্ত বইয়ের ২৬১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ বস্তুর পরিমিতি গুণ অবলুপ্ত হয়ে যায়। যান্ত্রিকতার (mechanism) ভিত্তিসমূহ মূলোৎপাটিত হয়ে গেছে। নিউটনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া (action-re-action) নিয়মও শেষ হয়ে গেছে।

উক্ত বইয়ের ২৬৭ পৃষ্ঠায় স্বতন্ত্র একটি শিরোনামা দাঁড় করিয়েছেন ঃ 'বস্তু' ধ্বংস হয়ে গেছে (matter has disappeared)। এ শিরোনামার অধীন 'বস্তু' এবং তার বিলীয়মানতা' পর্যায়ে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের পদার্থবিদ্যা বিশারদদের মতামত ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সে সমস্ত আলোচনার সারনির্যাস হল ঃ 'বস্তু বিলীন হয়ে যায়'।

বস্তুত বিজ্ঞান জগতে এ প্রত্যয় আজ বলিষ্ঠ রূপ পেয়েছে যে, 'বস্তু নশ্বর, তার কোন স্থিতি নেই।' তা কেবল নিজের অবস্থাই বদলায় না, স্বীয় সমস্ত বিশেষত্বও নিঃশেষ করে ধ্বংসও হতে থাকে। তাহলে বলা যায় ঃ বিজ্ঞান জগতের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হল—কুরআনের ভাষায় ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (الرحمن : ٢٦)

বিশ্বলোকে যা কিছু আছে, তা সবই ধ্বংসশীল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও বস্তুবাদীরা নিজেদের জিদ ও হঠকারিতা ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। বিজ্ঞানের সর্বশেষ পরীক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা ও ফলাফল দুনিয়ার বস্তুবাদের বিশেষ লোকদিগকে এক মহাসংকটের সম্মুখীন করে দিয়েছে। তারা কঠিন মানসিক ও আদর্শিক দ্বন্দ্বে বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত। বিজ্ঞানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত নিয়ম-বিধির ভিত্তিতে তারা 'বস্তু'কে 'অবিনশ্বর' ও 'চিরন্তন' 'শাশ্বত' মনে করে 'বস্তুবাদী দর্শন' গড়ে নিয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, এ দর্শনেরই ভিত্তিতে তারা রচনা

করেছিল 'বস্তুবাদী জীবন বিধান।' কিন্তু হায়! তাদের সুখের ভূ-স্বর্গ' চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে গেছে। বিজ্ঞানই তার পুরানো নিয়ম-বিধিকে ভুল বলে ঘোষণা করেছে। ফলে এই বেচারাদের জড়বাদ ভিত্তিক চিন্তা-বিশ্বাসের গোটা প্রসাদই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। অবশ্য তারা তাদের জড়বাদী চিন্তা ও বিশ্বাসের ব্যবস্থাকে অক্ষত রাখার উদ্দেশ্যে জড়বাদের একটা অনুকূল ব্যাখ্যা দিতে বহুদিন থেকেই বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছিল। লেনিন তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে এজন্যে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং বস্তুবাদের পরিবর্তে 'দ্বান্দ্বিক জড়বাদ' (dialectical materialism)-এর প্রচার করেছেন।

'বস্তু' সম্পর্কে উদ্ঘাটিত এসব নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের প্রেক্ষিতে এ্যাঞ্জেলস্ (Engels) বলেছিলেন ঃ 'বিজ্ঞানের প্রতিটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুবাদকেও পরিবর্তিত হতে হবে।'

অর্থাৎ বিজ্ঞান জগতে যখন এমন কোন তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হবে, যার ফলে বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটা নতুন অধ্যায় সূচিত হবে, তখন বস্তুবাদকে তার প্রাচীন রূপ পরিবর্তন করে একটা নবতর রূপ ও নতুনতম ব্যাখ্যা লয়ে আবির্ভূত হতে হবে। ফলে প্রাকৃতিক জগত-বহির্ভূত বস্তুবাদের (metaphysical materialism)-ই নতুন রূপ হচ্ছে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ।

বৈজ্ঞানিক সত্য নিরংকুশ মহাসত্য নয়

বিজ্ঞানের উদ্ভাবিত প্রাকৃতিক নিয়ম-বিধি এবং বৈজ্ঞানিক সত্য ও সত্ত্ব বিশ্ব-প্রকৃতির এমন নিয়ম-বিধি বা তত্ত্ব নয়, যা সেসবের অস্তিত্ব ও বাস্তবতার কারণসমূহ নির্ধারণ করতে পারে। আসলে তা প্রকাশ করে মানুষের মানসিক ঝোক-প্রবণতাকে, যা সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশ পর্যবেক্ষণের ফলে তাদের মনে জেগে ওঠে। কোন একটি জিনিস বা প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশ অনুভবের দরুন মানুষের যে মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা দেখা দেয়, তা-ই তো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক নিয়ম-বিধি রূপে নির্ধারিত ঘোষিত ও দুনিয়ায় পরিচিত।

আসলে তা চেতনার বিষয়বস্তু ও মানবীয় অনুভূতি। আর তার গুরুত্ব নিছক একটা আপেক্ষিক গুরুত্ব মাত্র (human destiny)।

এগুলোর যৌক্তিকতা ও যথার্থতা মানুষের মনস্তাত্বিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল নির্ভরশীল এ কথার উপর যে, একই বাহ্যাবস্থা সমস্ত মানুষের মন ও মানসের উপর একই ধরনের প্রভাব ও ফলাফল সৃষ্টি করবে। কিন্তু বিশ্ব প্রকৃতির বুকে

যেসব নিয়ম-বিধি বস্তুতই কার্যকর, প্রকৃতির আসল ও প্রকৃত তত্ত্ব যা তাকে উপরোক্ত মানসিক প্রভাব ও ফলাফল এবং মানব কল্পিত নিয়ম-বিধির সমান এবং এই শেষোক্তটিকে চূড়ান্ত সত্য মনে করে প্রথমোক্তটির পরিবর্তে শেষোক্তটি গ্রহণ করা অত্যন্ত মারাত্মক ধরনের ভুল ও চরম বিভ্রান্তিকর পদক্ষেপ। এই কারণে বৈজ্ঞানিক নিয়ম-বিধি ও বৈজ্ঞানিক সত্য প্রভৃতি শব্দ একটা সীমাবদ্ধ অর্থেই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। এগুলোকে আভিধানিক অর্থে গ্রহণ ও ব্যবহার করা অর্থাৎ নিজেদের অনুভূতিকেই চূড়ান্ত ও শাশ্বত মনে করা চরম মূর্খতা ও লজ্জাকর অজ্ঞতারই পরিচায়ক। সম্ভবত কোন বিজ্ঞানীই তা মনে করেন না।

মানুষের এমন কতগুলি অনুভূতি রয়েছে, যা সর্বদা একইভাবে একটার পর একটা একই পরম্পরা অনুযায়ী জাগ্রত হয়। আর আমরা ধরে ও মনে করে নিয়েছি যে, সেগুলো ভবিষ্যতেও সেই পরম্পরা অনুযায়ী সংঘটিত হবে। এটা আমাদের পরীক্ষিত সত্য। আর এই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রাণ। যেমন পানির তুলনায় অধিক ভারী শক্ত জিনিস পানিতে ফেললে তা ডুবে যাবে। এটা আমাদের চিরকালের পর্যবেক্ষিত সত্য। এই পরীক্ষণ পর্যবেক্ষণে আমাদের অনুভূতি নিম্নোক্তভাবে একের পর এক জেগে উঠে ঃ

১. সেই শক্ত ভারী জিনিসটির ওজনের অনুভূতি;

২. পানির ওজনের অনুভূতি;

৩. একটির তুলনায় অপরটির অধিক ভারী হওয়ার অনুভূতি;

৪. এই সব কয়টি অনুভূতির পর সেই শক্ত ভারী জিনিসটির পানিতে ডুবে যাওয়ার অনুভূতি।

ঠিক এই কারণে আমরা যখন পানির চাইতেও ভারী কোন শক্ত-কঠিন-নিরেট জিনিসকে পানিতে পড়তে দেখি, তখনই আমরা মনে করি—জিনিসটি ডুবে যাবে। এর ফলে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও সত্য এই দাঁড়াল যে, পানির তুলনায় অধিক ভারী শক্ত-কঠিন-নিরেট-জিনিস পানিতে পড়লে তা অবশ্যই ডুবে যাবে।

বৈজ্ঞানিক সত্য ও তত্ত্ব বিশ্বাস্য নির্ভরযোগ্য নয়

পদার্থ ও রসায়ন সংক্রান্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দৃশ্যাবলী—প্রভৃতি প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশ ও মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক ও অনুপাত সম্পর্কে যতক্ষণ পর্যন্ত যথেষ্ট অবহিতি না হবে, সে পর্যন্ত প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। আর এ সব জ্ঞান-তথ্যের ভিত্তিতে রচিত

সমস্ত নিয়ম-বিধি ও তত্ত্ব আংশিক এবং বিশ্বাস অযোগ্যই থাকবে। কেননা অবিমিশ্র বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণে চিন্তা-বিবেচনা করলেও মানুষের অবর্তমানতায় প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্বই প্রমাণিত হতে পারে না, কেননা এই মানুষই তো হচ্ছে প্রকৃতির বাহ্য প্রকাশ অনুভবকারী ও সমস্ত অনুভূতির সংরক্ষণকারী—সর্বোপরি, এই অনুভূতিসমূহকে পরস্পর সম্পর্কিত করে ফলাফল নির্ধারণকারী। সেই মানুষই যদি না থাকল, তাহলে মূল প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। অথচ আদর্শ বাদীদর্শনের ধারকগণ এই কথার উপরই তাঁদের দর্শনের ভিত্তি স্থাপিত করেছেন।

বিশ্বলোকে সকল প্রকার প্রবাহ সদা প্রবহমান। আমাদের চক্ষু কর্ণ ত্বক—প্রভৃতি কয়েকটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা তার সামান্য কয়টি প্রবাহই অনুভব করে থাকি এবং এই সবের সাহায্যে প্রবাহসমূহ আলো, ধ্বনি ও উত্তাপে পরিবর্তিত হয়। বিশ্বালোকে বস্তু, তার অণু ও বিন্দুসমূহ রয়েছে, কিন্তু সেগুলো যতক্ষণ আমাদের স্নায়ুর সাথে স্পর্শ না লাগাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মগজে সেগুলোর শক্ততা নম্রতা-মসৃণতা, স্বাদ ও গন্ধ—ইত্যাদির কোন অস্তিত্বই স্বীকৃত হবে না। আসলে এ সব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কোন অস্তিত্ব নেই। এগুলো তো বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানুষের স্নায়ু ব্যবস্থার মাঝে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট ফল মাত্র (human destiny)

বস্তুত মানুষের অনুভূতি শক্তিই যদি বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে অনুভূতির কার্যকারণ তো বর্তমান থাকবে, কিন্তু বস্তুর সেসব গুণ—যদ্দ্বারা তার পরিচয় পাওয়া যায়—শেষ হয়ে যাবে। বস্তুর গুণাবলীর অস্তিত্ব মানবীয় অনুভূতির উপর নির্ভরশীল। কাহারও অনুভূতি শক্তি দুর্বল হয়ে গেলে কিংবা তাতে কোনরূপ ত্রুটি দেখা দিলে তার পক্ষে দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসই আশ্চর্যজনক মনে হবে। কোন বিশেষ জিনিস সম্পর্কে সে এক কথা বলবে, আর অন্যান্য লোকেরা বলবে সম্পূর্ণ ভিন্নতর কথা। রেডিও সেট না থাকলেও ব্রডকাস্টিং কেন্দ্রের সাথে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তখন এইরূপ অবস্থা দাঁড়াবে যে, ধ্বনির প্রবাহ শূন্যে প্রবহমান থাকবে, আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের চারপাশে তা ঘুরপাক খাবে, কিন্তু আমাদের নিকট তার কোন অস্তিত্বই থাকবে না। সেসবের অস্তিত্ব যে আছে, তা জানবার জন্যে এক অতীব জটিল যন্ত্রের প্রয়োজন। সে যন্ত্রটি শূন্যলোক থেকে electro magnetic waves-কে ধরবে এবং তার wave lenth-কে ধ্বনিতে রূপান্তরিত করে দেবে। তারপরই আমাদের কর্ণের সাহায্যে সে ধ্বনিকে আমরা শুনতে ও অনুভব করতে পারব।

মানুষ ও বাহিরের দুনিয়ার পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটিও ঠিক এমনি। মানুষ যেন একটা রেডিও সেট। মানুষ বাহিরের জিনিসগুলির বিশেষত্বকে সেই বিশেষত্বে পরিবর্তিত করতে থাকে, বা সরাসরি যা যন্ত্রের সাহায্যে তার পর্যবেক্ষণে আসে (human destiny)।

প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশকে এমনিভাবে পরিবর্তিত করে বিজ্ঞানের বিষয়-বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে। অন্য কথায় বিজ্ঞানে আমরা যে প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশেরই অধ্যায়ন করি, তা স্বীয় প্রকৃত বিশেষত্ব ও আমাদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাসমূহের যৌগিক (compound) হয়ে থাকে। এই পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়নই আমাদের পরীক্ষণ-নিরীক্ষণের ভিত্তি। আর এই পরীক্ষণ-নিরীক্ষণের ভিত্তিতেই আমরা মতাদর্শ রচনা করে থাকি।

তার অর্থ এই যে, বিশ্ব-অধ্যয়ন থেকে আমরা যে মতাদর্শ রচনা করি, আসলে তা আমাদের মনস্তত্ব ও বিশ্বের অংশসমূহের মধ্যবর্তী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল। অর্থাৎ বিশ্বের অংশসমূহ আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের মন-মানসিকতা—তথা মনস্তত্ত্বের উপর একটা প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের মনস্তত্ত্বের দিক থেকে তার যা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়—এই দুইটির সংমিশ্রণে একটা ফল বের হয়। একেই আমরা আমাদের প্রতিক্রিয়া বলে জানি। আর এই প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতেই বিশ্বের অংশসমূহ ও জাগতিক বাহ্য প্রকাশের সহিত আমাদের আচরণ অবলম্বিত হয়। এই কারণেই আমাদের প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনে আমাদের বাস্তব আচরণেও পরিবর্তন সূচিত হয়।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ

এ পর্যন্তকার আলোচনা থেকে এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আমরা যদি কোন প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশকে পূর্ণ মাত্রায় বুঝতে চাই, তাহলে তার কার্যকারণসমূহই গভীর দৃষ্টিতে বিবেচনা করে দেখতে হবে। শুধু তা-ই নয়, প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশ ও তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার উপর যে প্রভাব প্রবর্তিত হয়, এতদুভয়ের মাঝে যে সম্পর্ক ও সম্বন্ধ রয়েছে, তা-ও গভীর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করতে হবে।

প্রত্যেক প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশ পর্যবেক্ষণের ফলে মানবীয় মনস্তত্ত্বের উপর একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। আর এই প্রতিক্রিয়াই আসলে জীবনের জন্য পথ নির্ধারণ করে। আমরা যদি এ প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশের কার্যকারণসমূহ জানতে পারি ও তা থেকে জীবনের পথ-নির্দেশ লাভ করি—বস্তুবাদীরা যেমন করছে—তাহলে আমাদেরকে চিরদিনের তরে বিভ্রান্ত হতে হবে। সঠিক পথের সন্ধান লাভ তো দূরের কথা, এসব বাহ্য প্রকাশের প্রকৃত ও প্রথম কারণটারও সন্ধান করা আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান

মানুষ যখন কোন প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশ সংঘটিত হওয়ার অনুভূতি পায়, তখন তা নিম্নোক্তভাবে পরপর কার্যকারণসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল ঘটবে ঃ

১. বস্তুর অণুসমূহের (atoms) স্বীয় বিশেষত্বের দিক দিয়ে পরস্পর মিলিত হওয়া বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। তার ফলে বিভিন্ন জিনিস গড়ে উঠে ও চূর্ণ হয়। যেমন হাইড্রোজেন অণু ও অক্সিজেন অণুর একটা বিশেষ আনুপাতিক হারে মিলিত হয়ে বাষ্প তৈরী করা ও বাষ্পের পানিতে রূপান্তরিত হওয়া। কার্বন-ডাই-অক্সাইডের চূর্ণ হয়ে অক্সিজেন অণু ও কার্বন অণুতে বিভক্ত হয়ে যাওয়া এবং কার্বনের পুনরায় অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সাথে মিশে বিভিন্ন ধরনের চর্বি বা উদ্ভিজ্জ তৈল (fats)পরিবর্তিত হওয়া প্রভৃতি। এভাবে আমরা যত জিনিসই দেখতে পাই, তা সবই বিভিন্ন বিশেষত্ব সম্পন্ন বস্তু অণুসমূহের মিলন-বিচ্ছেদেরই ফল হয়ে থাকে। রসায়ন শাস্ত্র (chemistry) এসব বিষয়েই তত্ত্ব ও তথ্য পেশ করে।

২. বস্তু অণুসমূহের মিলন-বিচ্ছেদে 'শক্তি'সমূহের শুষিত হওয়া বা নিষ্ক্রমিত হওয়া ও সংঘটিত হতে থাকা। শক্তি ব্যতিরেকে বিভিন্ন বিশেষত্ব-সম্পন্ন অণু মিলিত হয়ে কোন নতুন জিনিস বানাতে পারে না। যেমন হাইড্রোজেন এটম ও অক্সিজেন এটম স্বীয় বিশেষ অনুপাতে এক স্থানে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত একত্রিত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তাতে বাষ্প তৈরী হওয়ার মত কোন মিলন সংঘটিত হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্য থেকে কোন শক্তির অতিক্রমণ না ঘটবে। অনুরূপভাবে পানির দুটি আণবিক অংশ—হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন—যখন বিচ্ছিন্ন হয় তখন শোষিত 'শক্তি' বহিষ্কার করে। এরূপ কার্যক্রম ছাড়া শক্তির শোষিত হওয়া বা নিষ্ক্রমিত হওয়া ব্যতিরেকে কোন প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশ সংঘটিত হতে পারে না। বিভিন্ন শক্তি—চুম্বক শক্তি, তাপ, আলো, বিদ্যুৎ ইত্যাদি এমনিভাবেই সৃষ্ট হতে থাকে। এসব শক্তি ও বস্তু অণুর সাথে এগুলোর সম্পর্ক বিজ্ঞানের Physics শাখার আলোচ্য।

৩. এভাবে উৎপন্ন তাপ, আলো, চুম্বক, ধ্বনি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি যখন স্নায়ু ব্যবস্থার সম্পর্শে আসে, তখন সেসবের অস্তিত্ব আত্মপ্রকাশ করে। এসব প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশ ও মানবীয় স্নায়ুবস্থার (nervous system) মধ্যকার এই সম্পর্কও এ কারণে যে প্রতিক্রিয়া ও অবস্থার উদ্ভব হয়, সেসব বিষয়ে বিজ্ঞানের যে-শাখাটি আলোচনা করে, তার নাম 'মনোবিজ্ঞান (Psychology)।

৪. কিন্তু স্নায়ু ব্যবস্থার স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই। তা দেহের হজম-ব্যবস্থা, শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যবস্থা ও রক্ত প্রবাহ ব্যবস্থা প্রভৃতির সাথে গভীর সম্পর্ক সম্পন্ন। এ কারণে এসব ব্যবস্থা সম্পর্কেও সূক্ষ্ম জ্ঞানের আবশ্যক। জীববিদ্যা (biology) অধ্যয়ন করলেই তা জানা যায়।

৫. কিন্তু একই প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশ থেকে এক ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে এক প্রকারের প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করে, আর সামষ্টিকভাবে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ধরনের প্রতিক্রিয়া নিয়ে থাকে—একথা প্রমাণ সাপেক্ষ নয়। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ ছাড়াও এক প্রকারের সামষ্টিক শক্তি (force of society) থাকে, যার ওজন ও পরিমাপ গ্রহণের কোন উপায় বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারেনি। এ কারণে মানুষের সামাজিক-সামষ্টিক অবস্থা সম্পর্কেও জ্ঞান ও তথ্য অর্জন করা আবশ্যক। তাহলেই এ প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশের সমস্ত তত্ত্ব আমাদের বোধগম্য হতে পারে। এজন্যে আমাদেরকে সমাজ বিজ্ঞান (sociology) পড়তে হবে।

৬. এতদ্ব্যতীত আরও বহু কার্যকারণ এমন রয়েছে, যা প্রকৃতির বাহ্য প্রকাশের

রূপায়ণ করে, কিন্তু তা বিজ্ঞানীদের আয়ত্তে আজ পর্যন্তও আসেনি। কাজেই সেসবের অস্তিত্ব অস্বীকার করার কোন অধিকারও আমাদের নেই। বিজ্ঞানের এ শাখাভিত্তিক ব্যাখ্যা থেকে এ কথাটি অনেক মাত্রায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কোন প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশের প্রকৃত কারণ এবং সেসবের প্রকৃত ফলাফল সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করার জন্যে বিজ্ঞানের এতগুলো শাখায় অধ্যয়ন ও জ্ঞান আহরণ করা আমাদের জন্যে অপরিহার্য। অন্যথায় কোন বিষয়ে আমাদের কোন ব্যাখ্যাই যথার্থ হবে না, হবে ত্রুটিপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর। আর এই ধরনের ত্রুটিপূর্ণ অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আমরা যেসব প্রাকৃতিক আইন ও নিয়ম-বিধি রচনা করব, তা সব সময়ই ভুল হবে। আর ঠিক এই কারণেই বিশ্বলোকের অন্তর্নিহিত মহাসত্য জানবার ও এই মহাবিশ্বে মানুষের স্থান ও মর্যাদা নির্ধারণের ব্যাপারে মানবজাতি চিরকালই এমন এক মহান সত্তার পথ-প্রদর্শন লাভের মুখাপেক্ষী, যিনি উপরোদ্ধৃত সমস্ত কার্যকারণ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ও প্রত্যক্ষভাবে অবহিত। আর সে সত্তাই হচ্ছে একমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'আলা।

জীবন-ব্যবস্থার সন্ধান

আমাদের উপরোক্ত কথাটির গুরুত্ব অনুধাবনের জন্যে যদি আরও ব্যাখ্যা দেয়ার ও আরও স্পষ্ট করে কথা বলার প্রয়োজন অনুভূত হয়, তাহলে আমরা বলব, মানুষ তার জীবন সমস্যার সমাধানের জন্যে এমন সর্বজ্ঞ সুবিজ্ঞানী ও সর্বদ্রষ্টা মহান সত্তার পথ-প্রদর্শনকে অগ্রাহ্য করে যদি কেবল মাত্র বিজ্ঞান সাগরের গভীরতর তলায় ডুব দেয়, তাহলে সে যত গভীরে চলে যাবে, ততই সে তার জীবন-লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাবে।

একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটার ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। একজন মেধাবী শক্তিসম্পন্ন ও আর্দশবাদী ব্যক্তি যদি স্বীয় ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়নের মাধ্যমে এমন সব নিয়ম-নীতি ও আদর্শ নির্ধারণ করতে সচেষ্ট হয়, যার ভিত্তিতে এক উন্নতমানের আদর্শ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভবপর, এমন সমাজ যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় সর্বোত্তম যোগ্যতা প্রতিভার চর্চা ও উৎকর্ষ বিধানের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব বিকাশের অবাধ সুযোগ-সুবিধা ও অনুকূল পরিবেশ লাভ করতে পারবে, সে পথে তাকে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে না, সামাজিক-সামগ্রিক ও সাংস্কৃতিক জীবন তার সব কয়টি বিভাগ ও দিক হিসেবে উত্তম ও ত্রুটিমুক্ত হবে; তাহলে এই উদ্দেশ্য লয়ে সে দুনিয়ার সমস্ত জনবসতি ও সমাজ-সভ্যতার পরিভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণ করে, বিভিন্ন সমাজ ও সভ্যতার সূক্ষ্ম ও

গভীরতর সমালোচনাসূচক অধ্যয়ন চালানোর পর এক সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, সমস্ত সমাজ ও সভ্যতার প্রধান অংশ ও সারনির্যাস—মানুষ সম্পর্কে অধ্যয়ন সম্পূর্ণ না করছে, এই মানুষের সমন্বয়ে গঠিত সমাজ ও সভ্যতা সম্পর্কে কোন কথাই বোঝা যাবে না। কোন বিশেষ ফল লাভ করাও সম্ভবপর হবে না। আর প্রকৃত অবস্থাও তাই। যেসব নিয়ম নীতি মানব সমাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেও রাখে, তা মানবীয় গুণ ও বিশেষত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। তখন সে সমাজ ও সভ্যতার পরিবর্তে 'মানুষের' অধ্যয়ন শুরু করে দিতে বাধ্য হবে।

'মানুষ'—অধ্যয়ন করার অর্থ হল, মানুষের শারীরবৃত্ত ও জীবনধারা সংক্রান্ত বিদ্যা (psychology) ও অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা (anatamy); অন্য কথায় তার জীববিদ্যা সংক্রান্ত (biological) যাবতীয় দিকের অধ্যয়ন করতে হবে। সেই সঙ্গে তার মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা—প্রবণতা, আবেগ ও অনুভূতি সংক্রান্ত (psychology) অধ্যয়ন করা ছাড়া মানুষ সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

সে লোকটি উদ্যোগী হয়েছিল আদর্শ উন্নত সমাজ ও সমাজ ব্যবস্থা বুঝবার জন্যে অর্থাৎ সমাজবিদ্যার অধ্যয়ন করতে চেয়েছিল এ দৃষ্টিতে যে, একটি শান্তিপূর্ণ, উন্নত উৎকর্ষলব্ধ ও বিপর্যয়কারী সমস্ত উপাদান থেকে পবিত্র সমাজ গঠনের জন্যে কোন্ সব নিয়ম-নীতি অপরিহার্য, তা জানতে হবে। কিন্তু এই অধ্যয়ন ব্যাপদেশেই তার মনে এই প্রশ্ন প্রবল হয়ে দেখা দিল যে, মানুষের সমন্বয়ে গঠিত সমাজকে বুঝবার জন্যে সেই আসল মানুষ সম্পর্কে সর্বপ্রথম সম্যক জ্ঞান ও তথ্য অর্জন অপরিহার্য—অন্যথায় সমাজ বুঝতে পারা সম্ভব নয়। তখন সে সমাজবিদ্যার অধ্যয়ন মুলতবী রেখে ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্ব ও জীববিদ্যার অধ্যয়ন শুরু করে দেয়। কিন্তু সামাজিক-সামষ্টিক মনস্তত্ত্বের কতগুলি অংশ এমন যে,. সে সম্পর্কে ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্ব থেকে কোন পথপ্রদর্শনী লাভ করা যায় না। এই কারণে উভয় বিদ্যার-ই একই সঙ্গে এতটা গভীরতা সহকারে অধ্যয়ন জরুরী, যেন উভয়টি সম্পর্কেই তীক্ষ্ম তীব্র অন্তর্দৃষ্টি জেগে ওঠে। এই রূপ করা হলে তারপরই একজন লোক একটি সুষ্ঠু সুন্দর নিখুত সমাজ গঠনের মৌল ও সুদৃঢ় নিয়ম-নীতি জানতে পারে।

মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন

এরপর সে মনস্তত্ত্ব অধ্যয়নে মনোনিবেশ করে। অধ্যয়নকালে তার মনে অন্যান্য বহু প্রশ্নের সঙ্গে এই প্রশ্নটিও তীব্র হয়ে দেখা দেয় যে, মানুষের মনস্তত্ব তো মানুষের দেহের সাথে নিঃসম্পর্ক হতে পারে না। কেননা দেহের সাথে

মনস্তত্ত্বের গভীরতর সম্পর্ক বিদ্যমান এবং মনস্তত্ত্বের উপর দৈহিক অবস্থার প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রবর্তিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

কাজেই মানুষের দেহ ও মগজের সংগঠন সেসবের কাজ প্রভৃতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান-তথ্য লাভ না করে মানবীয় মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে নির্ভুল ও যথার্থ নীতি গ্রহণ করা কিছুতেই সম্ভবপর হতে পারে না। তা করা হলে মানবীয় মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে এমন সব মতাদর্শ মনে জেগে উঠবে, যার দরুন কোন এক সময়ই মানুষের সঠিক অবস্থা নির্ধারণ করা যাবে না। এই কারণেই মনস্তত্ত্ব বিশারদগণ (psychologists) চিন্তার ক্ষেত্রে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। আর প্রতিটি চিন্তার (school of thought) সাথে অন্যান্য চিন্তার রয়েছে মৌলিক মতবিরোধ।

মানুষের বিশাল কর্মক্ষেত্র মানুষের বিভিন্ন প্রকারের কর্মতৎপরতায় মুখরিত। বিভিন্ন তৎপরতার উৎস ও কারণ বিভিন্ন। কতগুলি তৎপরতা স্বজ্ঞা (intuition) সঞ্জাত, কতগুলি আবেগমূলক (sentimental) আর কতগুলি প্রত্যক্ষ উপলব্ধির (perception) নিঃসৃত। কতগুলি হয় জ্ঞান ও স্মরণশক্তির কারণে, কতগুলি আকীদা-বিশ্বাস ও ধারণা-অনুমানের ফলে। আবার অনেক কাজই মানুষ করে পরিবেশের চাপে পড়ে। মানুষের গতিবিধি ও তৎপরতা এমনিভাবে বহু কার্যকারণের ফলে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই সব গতিবিধি ও তৎপরতার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের যে-বিদ্যা, তা-ই মনস্তত্ত্ব বিদ্যা নামে অভিহিত। মনস্তত্ত্ববিদগণ এ সবের কোন এক ধরনের তৎপরতা ও তার মূল কারণ ও উৎসকে নিয়ে সমগ্র কর্মপরিসরের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার নীতি ও মতবাদ রচনা করতে চায়। এ বিশেষ চিন্তার ব্যক্তিবর্গ (school of thought) স্বীয় মনস্তত্ত্ব পন্থার ভিত্তি স্বজ্ঞার (intuition) উপর স্থাপন করে, কেউ করে প্রত্যক্ষ উপলব্ধির উপর, কেউ ধারণা কল্পনার ওপর, কেউ আবেগের ওপর, কেউ মনের কামনা বাসনার ওপর আর কেউ স্মৃতিশক্তির ওপর। এই কারণে তাদের মনস্তত্ত্ব পদ্ধতিতে মৌলিক ও গভীর পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুত কোন মনস্তত্ত্ব পদ্ধতিই পূর্ণ প্রত্যয় ও নিঃসংশয়তা সহকারে মানবীয় মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দিতে পারছে না। প্রত্যেক চিন্তা-পদ্ধতির অনুসারী ব্যক্তিবর্গই দ্বিধা ও সংশয়ে নিমজ্জিত। তাদের নিজেদের অর্জন করা জ্ঞান তথ্য ও রচিত নিয়ম নীতি মতাদর্শের উপর তাদের নিজেদেরই দৃঢ়প্রত্যয় নেই। প্রত্যেক চিন্তা-পদ্ধতির অনুসারী মনস্তত্ত্ববিদ নিছক অন্য চিন্তা পদ্ধতির সাথে মতপার্থক্যের কারণে নিজেদের পদ্ধতিকে শক্ত করে ধারণ করে আছে। প্রত্যেক নতুন চিন্তাপদ্ধতি পূর্ব থেকে চলে আসা চিন্তাপদ্ধতির প্রতিবাদেই

কায়েম হয়ে আছে। এই কারণেই বর্তমান মনস্তত্ত্বের কোন বিশেষ চিন্তা পদ্ধতির ব্যক্তিবর্গই মানবীয় কাজ-কর্ম ও তৎপরতার যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম নয়। শুধু তা-ই নয়, তারা বরং মানুষকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। এই কারণে মনস্তত্ত্ববিদ্যার ক্ষেত্রে যা কিছুই গবেষণা ও সন্ধান কার্য চলবে তা পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীববিদ্যা পর্যায়ের গবেষণা অনুসন্ধানের ন্যায় অকাট্য হতে পারবে না কখনই।

আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্যা নিম্নোক্ত ধরনের ছয়টি চিন্তাপদ্ধতিতে (school of thought) বিভক্ত ঃ

১. Structural psychology—মানুষের প্রত্যক্ষ লব্ধ জ্ঞানই হল এই চিন্তা পদ্ধতির কেন্দ্রবিন্দু। এ চিন্তা পদ্ধতির অনুসারীদের বক্তব্য হল, মানুষ যা কিছু করে তা তার প্রত্যক্ষ লব্ধ জ্ঞানের উপর ভিত্তিশীল। এই কারণে তার প্রতিটি কাজের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তার কোন-না-কোন প্রত্যক্ষ লব্ধ জ্ঞানের আলোকেই করা যেতে পারে।

২. Gestalt psychology—বিভিন্ন জিনিস সম্পর্কে মানুষ নিজের মনে মগজে যে ধারণার সৃষ্টি করে অর্থাৎ যে কাজের দ্বারা মগজ স্বীয় প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানকে বাইরের বস্তুসমূহের প্রতি 'কারণ' রূপে ফিরিয়ে দেয়, তা-ই হল এ চিন্তাপদ্ধতির কেন্দ্রবিন্দু।

৩. Associationism—এ পদ্ধতির চিন্তাকেন্দ্র হচ্ছে জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি। মানুষ তার পরিবেশের মধ্য থেকে সচেতন বা অবচেতনভাবে যাই পর্যবেক্ষণ করে তা মগজের অবচেতনায় সুরক্ষিত থাকে। যে অবস্থায় সে সেই চেতনা পেয়েছিল, সেই অবস্থা যখনই দেখা দেবে, তখন তার দ্বারা অনুরূপ তৎপরতা সংঘটিত হবে।

৪. Psycho-analysis—মানব-মনের কামনা-বাসনাই এ চিন্তাপদ্ধতির কেন্দ্র। বিশেষ করে যৌন ও লৈংগিক কামনা-বাসনা এখানে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই চিন্তাপদ্ধতিতে মানুষের প্রত্যেক কাজ-কর্ম ও তৎপরতার কারণ ও উদ্বোধন হচ্ছে যৌন কামনা-বাসনা। স্বপ্নের ব্যাখ্যাও এরই ভিত্তিতে দেয়া হয়। বলা হয়, মানুষ স্বপ্নে তাই দেখে, যা তার সেসব যৌন কামনা-বাসনার চরিতার্থতা রূপে প্রকাশিত হয়, যা জাগ্রত থাকা অবস্থায় পরিবেশের চাপের কারণে অপূর্ণ রয়ে গেছে এবং অবচেতনায় চেপে রয়ে গিয়েছে।

৫. Hormic psychology—এর চিন্তা-কেন্দ্র হচ্ছে উদ্দেশ্যবাদ। অর্থাৎ মানুষের প্রতিটি কাজের কোন-না-কোন সর্বশেষ উদ্দেশ্য থাকে—সে উদ্দেশ্য তার চেতনায় জাগ্রত থাক, আর না-ই থাক।

৬. Personalism—এ পদ্ধতি স্বীয় মনস্তত্ব মানুষের সমগ্র সত্তার উপর স্থাপন করে।

উল্লিখিত প্রত্যেক চিন্তাপদ্ধতির ব্যক্তিবর্গের দাবি হল, মানবীয় কাজ-কর্ম ও তৎপরতার যে ব্যাখ্যা সে পেশ করে কেবলমাত্র তাই সত্য, যথার্থ ও প্রকৃত।

সুষ্ঠু জীবন-ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থার সন্ধানকারী যখন মনস্তত্ত্ব বিদ্যার এ গভীর তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিতি লাভ করে, তখন সে এ অধ্যয়ন শুরু করে দেয়। মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও দেহ-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার অধ্যয়নকালে সে যখন হজম-ব্যবস্থা (digestive system), শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যবস্থা (respirratory system) ও রক্তধারা প্রবাহের পদ্ধতি (vascular system) প্রভৃতির সম্মুখীন হয়, তখন সে বুঝতে পারে যে, এই ব্যবস্থা ও পদ্ধতিসমূহের ভিত্তি কতিপয় রাসায়নিক বস্তু ও সেগুলোর পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফল হিসেবে কতিপয় রাসায়নিক রদ-বদলের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং মনে হয়, দেহের গোটা ব্যবস্থাই রাসায়নিক রূপান্তরের (metabolism) অভিন্ন রূপ। এখন সে চিন্তা ও বিবেচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, মানবদেহের অস্তিত্ব ও তার ক্রমবর্ধন যখন রাসায়নিক রূপান্তরেরই ফসল, তখন রাসায়নিক রূপান্তরের নিয়মাবলীই সর্বপ্রথম ভাল করে বুঝে নেয়া দরকার। অন্যথায় মানবদেহ তার সংগঠন ও তার ক্রমবর্ধন সম্পর্কে প্রকৃত ও আশ্বস্তিমূলক (convincing) তথ্য পাওয়া যাবে না। এ কারণে সে অতপর রসায়ন ও পাদর্থবিদ্যার অধ্যয়নে মনোনিবেশ করে। কিন্তু বিজ্ঞানের এসব শাখার সঙ্গে সঙ্গে তাকে জীব বিদ্যার অধ্যয়নও চালিয়ে যেতে হয়। কেননা এ বিদ্যা ছাড়া নিছক রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার (chemistry and physics) অধ্যয়নের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পর্কে কোন ধারণাই করা যাবে না। তার কারণ হল-পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন তো প্রাণহীন-পদার্থ সম্পর্কেই বলে। প্রাণী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জন্যে তা থেকে কোন পথ-প্রদর্শনই পাওয়া যেতে পারে না।

রসায়নবিদ্যার অধ্যয়ন

এরপর সে যখন রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার অধ্যয়ন করতে শুরু করে তখন সে এ পর্যন্ত সহজেই পৌছে যায়, যেখানে থেকে সে অণু (molecules) ও পরমাণুর

(atom) আলোচনা শুরু হয়ে যায়। পরমাণুর যৌগিক অংশ ইলেকট্রোন ও প্রোটন ইত্যদির—যা বিদ্যুৎ ছাড়া আর কিছুই নয়—অধ্যয়নে আসে। ফলে সে বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ পর্যায়ে প্রবেশ করে। একে বলা হয় nuclear science (পারমাণবিক বিজ্ঞান)। এভাবে সমাজ বিজ্ঞান বুঝবার জন্যে তাকে ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞানের অন্যান্য সমস্ত বিভাগ অতিক্রম করে অণু ও পরমাণু এবং অতপর বিদ্যুৎ প্রবাহের অধ্যয়নে নিয়োজিত হতে হয়েছে। এখানে সে ইলেকট্রোন ও প্রোটন সম্পর্কে জানতে ও জ্ঞানাহরণ করতে শুরু করে। এ পর্যায়ে সে পরমাণুর বিশেষত্ব ও প্রতিক্রিয়ার অধ্যয়ন করে। সে সবের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থেকে ফল গ্রহণ করে, সেগুলো চূর্ণ করতেও সফল হয় এবং চূর্ণ করে অপরিসীম শক্তি অর্জন করে। শেষ পর্যন্ত সে জানতে পারে যে, পরমাণু চূর্ণ করে হ্যাঁ-ধর্মী বিদ্যুৎবাহী ইলেকট্রোন, প্রোটন ও নিউট্রনে অবলুপ্ত হয়ে যায়। পরমাণুর একটা বিশেষ গতি ও হিসেব অনুযায়ী চূর্ণ হতে থাকার কথাও সে জানতে পারে। তার সাহায্যে সে পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে সমর্থ হয়। এ সবই সে জানতে পারে। কিন্তু কোন একটি বিদ্যা থেকেও সে এমন কোন সূত্র লাভ করতে পারে না, যা ধরে সে পূর্বানুরূপ ক্রমে ক্রমে উপরের দিকে উঠে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা থেকে জীববিদ্যা ও জীববিদ্যা থেকে মনস্তত্ত্ব এবং মনস্তত্ত্ব থেকে সমাজ বিদ্যা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, আর যে বৃহত্তর উদ্দেশ্যে সে এত দীর্ঘ কঠিন পথ পরিক্রমা করে এসেছে, তা পেয়ে যেতে পারে। সে বেচারা তো শেষ পর্যন্ত অণু ও পরমাণুর অধ্যয়ন জালে ফেঁসে যায়। এখান থেকে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হওয়ার কোন পথই আর উন্মুক্ত থাকে না।

ইলেকট্রোন ও প্রোটন ইত্যাদির বিশেষত্ব ও ক্রিয়া পর্যায়ে যত গভীর অধ্যয়নই চালানো হোক এবং সে সম্পর্কে যত পূর্ণাঙ্গ ও সম্যক জ্ঞান-তথ্যই অর্জিত হোক, তা থেকে এগুলোর সমন্বয়ে গঠিত পরমাণুসমূহ সম্পর্কে কোন সামান্যতম ইশারাও পাওয়া যেতে পারে না। 'এটম' ও নিউক্লিয়ার অংশসমূহের মাঝে কি সম্পর্ক ও সম্বন্ধ, রসায়নবিদ্যার পারদর্শীরা আজ পর্যন্তও তার কোন হদিস করতে পারেনি। আজ পর্যন্তকার পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ এ কথাই বলে যে, নিউক্লিয়ার অংশসমূহে এমন কোন বিশেষত্বের সন্ধান করা সম্ভব হয়নি, যার সাহায্যে এসব অংশের যৌগিক এটমসমূহ সম্পর্কে কোন ধারণা জন্মিতে পারে। এটম অধ্যয়ন সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে ও নতুন পর্যবেক্ষণ মানদণ্ডের সাহায্যে সম্পন্ন করতে হবে। অনুরূপভাবে এটমসমূহের অধ্যয়ন ও তার যৌগিক মলিকিউলের (কণার) বিশেষত্ব সম্পর্কে কোন জ্ঞানই দেয় না। পানির একটি মলিকিউল হাইড্রোজে

এটম ও অক্সিজেন এটমের যৌগিক। এটা বাস্তব সত্য। ভিত্তিহীন ধারণা-অনুমান নয়। পানির একথা 'মলিকিউল (কণা) হাইড্রোজেনের দুটি এটম ও অক্সিজেনের একটি এটমের যৌগিক। অতএব হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের বিশেষত্ব পানিতেও পাওয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। বিবেক ও যুক্তি—দুটিরই দাবি এটা। কিন্তু রাসায়নিক পর্যবেক্ষণ বলে, এ দুটির বিশেষত্বে কোথাও দূরতম সামঞ্জস্যও নেই। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের অধ্যয়ন পানির কোন বিশেষত্বের কথা বলে না, না পানির বিশেষত্ব তার যৌগিক অংশসমূহের অক্সিজেন হাইড্রোজেনের বিশেষত্বের সহিত কোন মিল রাখে। খাবার লবণের অবস্থাও অনুরূপ। রাসায়নিক ভাষায় খাবার লবণকে বলা হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড। তা সোডিয়াম ও ক্লোরিনের যৌগিক। সোডিয়ামও এমন একটা ধাতব পদার্থ, যা পানিতে পাড়লেই জ্বলে উঠে। আর ক্লোরিন একটা বিষাপ্ত গ্যাস বিশেষ। কিন্তু এই দুটিই যখন রাসায়নিক পদ্ধতিতে মিশ্রিত হয়, তখন খাবার লবণের ন্যায় একটা খাদ্যবস্তু তৈরী হয়। সোডিয়াম ও ক্লোরিনের বিশেষত্ব ও ক্রিয়া সম্পর্কিত জ্ঞান-তথ্যের ভিত্তিতে আমরা কি করে জানতে পারি যে, এ দুটো সংমিশ্রিত হলে খাবার লবণের ন্যায় জিনিস তৈরি হতে পারে? খাবার লবণের বিশেষত্ব জানবার জন্যে আমাদেরকে স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা চালাতে হবে। সেজন্য পর্যবেক্ষণ মানদণ্ড ও পদ্ধতি বদলাতে হবে। কিন্তু এই পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ও পর্যবেক্ষণ মানদণ্ড দ্বারা যা এটমের বিশেষত্ব জানবার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছিল—যৌগিকের বিশেষত্ব কোন ক্রমেই জানা যেতে পারে না।

প্রাণবন্ত বস্তু

আজ পর্যন্ত যত রাসায়নিক যৌগিকের খোঁজ পাওয়া গেছে, সেসবের বিশেষত্ব ও সেসবের যৌগিক অংশসমূহের বিশেষত্বে কোরূপ সামঞ্জস্য ও মিল-মিশ পাওয়া যায় না। 'প্রোটোপ্লাজম' একটা প্রাণবন্ত জীবন্ত বস্তু। তা কতিপয় প্রাণহীন যৌগিকের এমন যৌগিক, রাসায়নিক ভাষায় যাকে বলা হয় colloid (কলয়ড—আঠাল পদার্থ বিশেষ)। প্রোটোপ্লাজমের বিশেষত্ব ও তার যৌগিক অংশসমূহের বিশেষত্বে কোন সামঞ্জস্য নেই। প্রোটোপ্লাজমের যৌগিক অংশগুলি পরস্পরে যে আনুপাতিক হার রয়েছে সেই আনুপাতিকতা অনুযায়ী সেই অংশগুলিকে সংমিশ্রিত করা হলে সেই 'প্রোটোপ্লাজম' হয় না যা জীবন্ত ও প্রাণবন্ত। অথচ অন্যান্য রাসায়নিক যৌগিকসমূহ—সেগুলোর যৌগিক অংশসমূহ অনুরূপ আনুপাতিক হারে মিশ্রিত করলে—সহজেই গড়ে উঠে। কিন্তু এ পদ্ধতিতে প্রোটোপ্লাজম গড়ে উঠে না। প্রোটোপ্লাজমে যেসব উপাদান ও অংশ

রয়েছে, বিজ্ঞান সেগুলো জানতে পেরেছে। সেগুলোর বিশেষ আনুপাতিক হারও জানা গেছে। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে এমন কোন্ বিন্যাস রয়েছে, যা অক্ষুণ্ন থাকলে প্রোটোপ্লাজম জীবন্ত প্রাণবন্ত হয়ে যায়, আর সে বিন্যাস বিনষ্ট হয়েই এই প্রাণবন্ত জীবন্ত প্রোটোপ্লাজম প্রাণহীন ও জীবনীশূন্য হয়ে দাঁড়ায়—তা-ই আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। মনে হয়, সেই বিশেষ বিন্যাসটিই আসল জিনিস, যা প্রাটোপ্লোজমে প্রাণের সঞ্চার হওয়ার জন্যে দায়ী। আর প্রোটোপ্লাজমের রাসায়নিক বিশ্লেষণ যখন করা হয়েছে তখন তাতে প্রাণ ছিল না। প্রোটোপ্লাজমে প্রাণ বর্তমান থাকা অবস্থায় তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ কখনই করা হয়নি। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তা না করা হবে—প্রাণের বর্তমান তাকা অবস্থায় প্রোটোপ্লাজমের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা না হবে, সেই বিশেষ বিন্যাস সম্পর্কে বিজ্ঞান চিরকালই অন্ধকালে ডুবে থাকতে বাধ্য হবে। কিন্তু এ ধরনের পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ চালাবার জন্যে সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, ব্যবহার করতে হবে নতুন পর্যবেক্ষণ মানদণ্ড। বিজ্ঞান দীর্ঘদিন ধরে এ পদ্ধতি ও মানদণ্ডের সন্ধান করছে; কিন্তু আজ পর্যন্ত তার সামান্য মাত্রও আয়ত্তে আসেনি।

এ পর্যায়ে আল্লাহ্‌র ঘোষণা হল, প্রাণ বা রূহ্ 'এক খোদায়ী হুকুম' মাত্র। মানুষ যখন নিজের হুকুম ও কামনা-বাসনারই রাসায়নিক বিশ্লেষণ করতে পারে না, তখন খোদায়ী হুকুমের রাসায়নিক বিশ্লেষণ কি করে করতে সক্ষম হবে?

মানুষের দেহ

মানুষের দেহ প্রোটোপ্লাজমের (protoplasm) অসংখ্য কোটি কোষের সমন্বয়ে গঠিত। একই 'জড়' থেকে বিভিন্ন আকৃতির ও বিভিন্ন প্রকৃতি ও বিশেষত্বের কোষ তৈরী হয়েছে। একই গঠনাকৃতি ও একই বিশেষত্বের বহু কয়টি কোষ মিলিত হয়ে 'টিস্যু' (tissue) সূক্ষ্ম বস্ত্রবৎ বোনা কোষসমূহ বানিয়েছে এবং কতগুলি 'টিস্যু' একত্রিত হয়ে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠিত হয়েছে। আর এই সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আনুপাতিক সংযোজনের ফলেই পূর্ণাঙ্গ মানব দেহ তৈরী। ইতিপূর্বের আলোচনায় প্রোটোপ্লজম সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-তথ্যের সীমা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। সেই সীমার ওপারের কথাবার্তা অর্থাৎ তার যৌগিক অংশসমূহ কোন বিশেষ বিন্যাসে সুবিন্যস্ত, যার ফলে তাতে প্রাণের সঞ্চার হয়ে পড়ে—বিজ্ঞানের আওতার সম্পূর্ণ বহির্ভূত ব্যাপার।

প্রোটোপ্লাজমে প্রাণের সঞ্চার কিভাবে হয়, পরে তা বের হয়ে যায় কিভাবে, তার অন্তর্নিহিত মহাসত্য তো তা-ই যা কুরআন মজীদে বলে দেয়া হয়েছে।

তাতে বলা হয়েছে ঃ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي 'জানিয়ে দাও, রূহ বা প্রাণ একান্তভাবে আমার রব্ব-এর ব্যাপার—রব্ব-এর ফরমান। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা যদি তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে কোন বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ গঠন করতে ইচ্ছা করি, তাহলে শুধু এইটুকুই হতে পারে যে, প্রোটোপ্লাজমের যৌগিক অংশসমূহ যখন একটা বিশেষ বিন্যাস ও পরম্পরা অনুযায়ী সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ হয়ে যায়, ঠিক তখনই তাতে প্রাণের (রূহ) সঞ্চার হয়। এক টুকরা ইস্পাতের ম্যাগনেটিক চুম্বক সৃষ্টি হওয়া ও তা বের হয়ে যাওয়া সম্পর্কে যতগুলো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও মত তৈরী হয়েছে, তার মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় মত হল molecular theory (আণবিক তত্ত্ব মত)। তাতে বলা হয়েছে—লৌহ বা লৌহের ন্যায় অন্যান্য মৌল উপাদানের অণুর (molecules) প্রকৃতিগত বিশেষত্বই এই যে, তা চুম্বকধারী হয়ে থাকে। তা চুম্বক শক্তির প্রদর্শন করে তখন, যখন তা একটা বিশেষ পরম্পরা বিন্যাসে সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ হবে। এই বিন্যাস যখনই বিশ্লিষ্ট বিলীন হয়ে যাবে, তখনই চুম্বক শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এভাবে যে লৌহটুকরায় চুম্বক শক্তি নেই, তা যখন কোন চুম্বক শক্তিসম্পন্ন ইস্পাতের সহিত ঘর্ষণ খাবে, তখনই তা চুম্বক শক্তিসম্পন্ন হয়ে যাবে। আবার যখন সেটি মাটিতে নিক্ষিপ্ত হবে কিংবা উত্তপ্ত করা হবে, অথবা কোন শক্ত বস্তু দ্বারা সেটিকে পিটানো হবে, তখন-ই তা চুম্বক শক্তি হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু ইস্পাতের টুকরার সংগঠন-আকৃতি ও বর্ণের উপর তার 'অণু' সমূহের সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ হওয়া ও বিশ্লিষ্ট-বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোন পার্থক্য প্রতিফলিত হয় না। অন্য কথায়, চুম্বক শক্তিসম্পন্ন হওয়ার তাৎপর্য হল এই যে, 'অণূ'সমূহে সেই বিশেষ সুসংবদ্ধতা গড়ে উঠেছে। আর চুম্বক শক্তি বের হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে সেই বিশেষ ধরনের সুসংবদ্ধতা বিগড়ে গেছে।

'প্রোটোপ্লাজম' সম্পর্কেও এই কথা খাটে। অর্থাৎ তার যৌগিক অংশসমূহ সেই বিশেষ সংস্থা-শৃঙ্খলায় সুসংবদ্ধ হয়ে গেলে তাতে প্রাণের সঞ্চার হবে। আর যখন তা বিগড়ে যাবে, প্রাণ নিষ্ক্রমিত হবে। তাতে প্রাণ থাকবে না।

এ হল 'প্রোটোপ্লাজমের' সাধারণ বিশেষত্ব। উদ্ভিদ, জীব-জন্তু ও মানুষের প্রোটোপ্লজমে এই বিশেষত্ব সমানভাবে বর্তমান। কিন্তু মানবদেহ যে 'প্রোটোপ্লাজমে' তৈরী, তাতে কেবল প্রাণসম্পন্ন হওয়ার বিশেষত্বই নেই। তাতে সেই সব বিশেষত্বেরই পূর্ণ সমারোহ রয়েছে, যা এক পূর্ণাঙ্গ মানবদেহ থেকে প্রকাশ পায় অর্থাৎ মানুষের দেহ প্রকৃতি, বিবেক, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা—সর্ব বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ও জীবন্ত। যে 'প্রোটোপ্লাজম' থেকে এই দেহ

তৈরী, তাতেও এইসব দিক পূর্ণমাত্রায় বর্তমান ছিল। দেহ সংস্থার বিচারে তা সুডৌল ও অতিশয় সুন্দর। অন্যদিকে বিবেক বুদ্ধির প্রতিমূর্তি। সেই সঙ্গে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার উচ্চতর মর্যাদায় অভিষিক্ত। মনুষ্যত্বের পূর্ণাঙ্গতা ও পরিপূর্ণতার অর্থ মানবীয় জড় বস্ত human protoplasm—এর সমস্ত বিশেষত্বের পরিপূর্ণ সমন্বিত রূপ।

এ থেকে জানা গেল, মানবীয় মৌল বস্থু প্রকৃতপক্ষে প্রোটোপ্লাজমের এমন একটা প্রকার, যাতে 'বস্তুর কোনরূপ পরিবর্তন ব্যতীতই আকৃতি ও প্রকৃতিগত বিশেষত্বে পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। বিজ্ঞানের পরিভাষায় একেই বলা হয় 'আকৃতিগত রূপান্তর'। কার্বন, ফস্‌ফরাস, গন্ধক প্রভৃতি মৌল উপাদান (elements) সমূহ নিজ নিজ allotropy atoms বা বিচিত্ররূপী পরমাণুর বিভিন্ন বিন্যাস ও পরস্পরার কারণে বিভিন্ন প্রকারে পাওয়া যায়। 'গ্রাফাইট' (graphite) ও হীরা একই মৌল উপাদান—কার্বনের—দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন বিশেষত্বের প্রকার। এগুলোর মধ্যে আকাশ-পাতালের পার্থক্য রয়েছে। উভয়ই কার্বন, শতকরা একশ' ভাগই কার্বন। কার্বন ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু তার একটি কালো, কুশ্রী আর অন্যটি চরম চাকচিক্যপূর্ণ ও সুশ্রী সুদর্শন। পেন্সিলের মধ্যকার যে জিনিস দ্বারা কাগজের উপর লেখা হয়, তা 'গ্রাফাইট' (কৃষ্ণসীম নামক ধাতু) দ্বারা তৈরী। তার মূল্য ও হীরার মূল্যে কত যে পার্থক্য তা তো সকলেরই জানা। দুটোতেই কার্বন এটমের বিন্যাস ভিন্ন ভিন্ন । এই কারণেই উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য সৃষ্ট হয়েছে। কোন লোক নিজে পরীক্ষণ চালিয়ে ও রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে না দেখলে 'গ্রাফাইট' ও হীরা একই মৌল বস্তুর দুটি ভিন্ন ভিন্ন রূপ এ কথা সত্য বলে মেনে নিতে প্রস্তুত হবে না। ফস্‌ফরাসও অনুরূপভাবে দুটি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিগত বিশেষত্বের হয়ে থাকে। একটি লাল ও একটি হলুদ। একটি বিষাক্ত আর অন্যটি বিষাক্ত নয়।

প্রোটোপ্লাজমের প্রকৃতিগত ও রাসায়নিক অধ্যয়নে একথা অকাট্যভাবে সম্প্রমাণিত যে, বিজ্ঞানের কোন বিভাগই কিংবা বিজ্ঞানের সমস্ত বিভাগ সম্মিলিতভাবেও প্রোটোপ্ল্যাজমে প্রাণের সঞ্চার কিভাবে ঘটে, তা জানতে পারেনি। তাহলে মানবীয় প্রোটোপ্লাজমের বিশেষ বিশেষত্বের বিশ্লেষণ করা তার পক্ষে কি করে সম্ভবপর হতে পারে! পরন্তু বিজ্ঞান যখন মানুষের প্রকৃতিগত—পদার্থ সংক্রান্ত অবস্থা সম্পর্কেই পুরাপুরি জ্ঞান ও জরুরী তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনি, তখন তার বিবেক-বুদ্ধি, নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি দিক দিয়ে মানুষের বিচার বিশ্লেষণ করা বিজ্ঞানের পক্ষে কি করে সম্ভবপর হতে পারে?

বিজ্ঞান অধ্যয়নে জীবন বিধান পাওয়া যায়নি

এই পর্যন্ত পৌঁছে জীবন বিধান বা সমাজ ব্যবস্থার সন্ধানকারী সেই ব্যক্তির অবস্থাটা কি দাঁড়াল, একবার স্মরণ করুন। বেচারা কত সীমাহীন প্রান্তর পেরিয়ে কত বন্ধুর কষ্টকর পথ অতিক্রম করে কত উত্তুঙ্গ পর্বতমালা পরিক্রম করে জ্ঞান-সমুদ্রের পাহাড়-সমান তরঙ্গ শীর্ষের উপর দিয়ে সম্মুখের দিক ছুটে চলে ও এক সুষ্ঠু ও নিখুঁত সমাজ ব্যবস্থা ও জীবন ব্যবস্থার মৌল নিয়ম-নীতির কোন সন্ধানই লাভ করতে পারল না! বৈষয়িক ও বস্তুগত উন্নতি উৎকর্ষের সকল উপায় আয়ত্ত করা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে, কিন্তু সে সব দিয়ে তার সেই আসল লক্ষ্য অর্জিত হল না—যেজন্যে সে এই মহাযাত্রা শুরু করেছিল, উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল অজানাকে জানবার জন্যে।

বিজ্ঞানের মহা উন্নতি সংঘটিত হয়েছে—তা অস্বীকার করবে কে? বিশ্বপ্রকৃতির গভীরে নিহিত শক্তি ও সম্পদসমূহ আবিষ্কার করে সেগুলোকে মানুষ নিজের দাসানুদাস বানিয়ে নিয়েছে—নিতে পারছে। তারা দ্বারা সে যা ইচ্ছা, সেই কাজই করছে, করাচ্ছে, করাতে পারছে। এটম শক্তির বলে সে দুর্ভেদ্য পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে সক্ষম হচ্ছে। বরফে আচ্ছন্ন বিশাল অঞ্চলে এই বিজ্ঞানেরই সাহায্যে বিপুল জনবসতি গড়ে তুলতে পারছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে কেবল পৃথিবীর উপরই নয়, মহাশূন্যে অভিযান চালিয়ে বিশ্ববাসীকে হতবাক—চমৎকৃত বিস্মিত করে দিয়েছে। চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহেও মানুষের অধিগমন সম্ভব করে দিয়েছে। নভোমণ্ডলের অবয়বসমূহ থেকে মানুষ সেই ধরনের সব কাজই করাতে পারছে, যা সে পৃথিবীর যে কোন জিনিস দ্বারা করাতে সক্ষম। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে মানুষ যে জিনিসের স্বপ্নও দেখেনি—দেখতে পারত না, কল্পনা করাও সম্ভবপর ছিল না, বিজ্ঞানের কৃপায় আজ সে তা সব কিছুই বাস্তবে করে দেখাতে পারছে। এ প্রেক্ষিতে যদি কেউ এ কথা চিন্তা করে থাকে যে, এই সবই যখন সম্ভবপর হয়েছে, তখন এই বিজ্ঞানই মানুষকে তাদের নিজেদের জীবন ও সমাজের জন্যে পূর্ণাঙ্গ বিধান ও ব্যবস্থা রচনা করার যোগ্যও বানাতে পারে;—তার জন্য আল্লাহ ও আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েতের প্রয়োজন কোথায়? বিজ্ঞানের চরমোন্নতির এই সোনালী যুগে মান্দাতার আমলের এসব চিন্তা এ কালের লোকদের মন ও মগজে কি প্রভাব বিস্তার করতে পারে?.....পূর্ববর্তী দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সেসব লোককে নতুন করে চিন্তা-বিবেচনা করার আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা এখানে বিজ্ঞানের যে ব্যাখ্যা ও

বিশ্লেষণ পেশ করেছি, তার আলোকে নতুন করে যাচাই করে দেখতে হবে, উপরোক্ত রূপ চিন্তা-ভাবনা কতটা যুক্তিসঙ্গত! কেউ যদি নিজে বিজ্ঞানের অ-আ, ক-খ-ও না জানে, তাহলে যারা জানে তাদের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করা আবশ্যক। তাহলে নিঃসন্দেহে জানতে পারা যাবে, বিজ্ঞানের অহমিকতায় এ ধরনের চিন্তা ও বিশ্বাস শুধু ভিত্তিহীনই নয়, অত্যন্ত মারাত্মকও বটে। বিজ্ঞান নিজেই তার যে অক্ষমতা ও অপারগময়তার কথা অকপটে ও উদাত্ত কণ্ঠে স্বীকার করছে, তার পক্ষে ভূরি ভূরি সাক্ষ্যও পেশ করছে, সে কাজ তার দ্বারা সম্ভব বলে কোন মানুষের মনে করে বসা চরম মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। অনতিবিলম্বে তার এ নির্বুদ্ধিতা ও মুর্খতা পরিহার করা কর্তব্য। মহাসত্যের পরিপন্থী ও মুর্খতা নির্বুদ্ধিতার অনুকূলে বিজ্ঞানের দলীল-প্রমাণ পেশ করা চূড়ান্তভাবে হাস্যকরই বটে।

মানুষের মনস্তত্ব ও জীবন বিধানের ভিত্তি

এ পর্যায়ে আমাদের বিচার্য ও বিবেচ্য হচ্ছে—যেসব মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণ, যা একটা সুষ্ঠু, নিখুঁত শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ও তা স্থায়ী করে রাখতে পারে। এরূপ একটি উন্নত আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার জন্যই পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিজ্ঞানের সমগ্র শাখার পরিক্রমা ও আঁতিপাতি করে সন্ধান অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু মানুষের দ্বারা এমন একটি সমাজ গঠন করাতে পারে যেসব কার্যকরণ, তার কোন খোঁজ পাওয়াই সম্ভব হয়নি। সমাজ গঠনের মানবীয় মনস্তত্ত্বের প্রভাব কতখানি, এ পর্যায়ে তা-ই আমাদের আলোচ্য।

মনস্তত্ত্ব ও মতাদর্শের সম্পর্ক

বিজ্ঞানে আমরা যে প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশেরই (natural phenomenon) অধ্যয়ন করি, তা তার প্রকৃত বিশেষত্বসমূহ এবং আমাদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাসমূহের সমষ্টি। এই পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়নের উপরই আমাদের পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জন ভিত্তিশীল। এ সব পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমেই আমরা মতাদর্শ গ্রহণ ও রচনা করি। তার অর্থ এই যে, বিশ্বলোক অধ্যয়ন করে আমরা যে মতবাদ-মতাদর্শ রচনা করি, আসলে তা আমাদের মনস্তত্ত্ব ও বিশ্বলোকের বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল। অর্থাৎ বিশ্বলোকের বিভিন্ন অংশ আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের মনস্তত্ত্বের উপর একটা প্রভাব বিস্তার করে—একটা ক্রিয়া করে। আর আমাদের মনস্তত্ত্বের দিক থেকেও তার একটা প্রতিক্রিয়া ঘটে। এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সংমিশ্রণে একটা ফল দেখা দেয়। আমরা তাকে বলি আমাদের গৃহীত প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতেই অবলম্বিত হয় আমাদের বাস্তব আচরণ। এই কারণে বলা যায়, আমাদের গৃহীত প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনে আমাদের বাস্তব আচরণেও পরিবর্তন আসে।

এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, একই ধরনের বিভিন্ন বাহ্য প্রকাশ (phenomenon)

বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব করে, তখন তাতে যে কেন্দ্রীয় ও সম্মিলিত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তাই এই ধরনের সমস্ত প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশ সম্পর্কে একটা পরিপক্ক প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে—সে বাহ্য প্রকাশ যা এ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণে এসেছে কিংবা ভবিষ্যতে কখনও পর্যবেক্ষণে আসবে, সব সম্পর্কেই এই পরিপক্ক প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে আমরা এ ধরনের সংঘটিতব্য প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশ সম্পর্কে তার সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই লক্ষণ ও নিদর্শনসমূহ নির্দেশ করতে পারি, সংঘটিত হওয়ার পর তার বাখ্যা ও বিশ্লেষণও করতে পারি। এই পরিপক্ক প্রতিক্রিয়াই মূলত আমাদের বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ। ইতিপূর্বে এ পর্যায়ের বহু কয়টি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে।

আমাদের প্রকৃতি নিহিত ও স্বজ্ঞাজনিত অবস্থাসমূহই আমাদের মনস্তত্ত্ব গঠনের গুরুত্বপূর্ণ যৌগিক অংশ। আমাদের ঝোঁক-প্রবণতা, আমাদের মনের কামনা-বাসনা-লালসা, অনুসন্ধানপ্রিয়তা ও আত্মনিবেদন—দাসত্ব গ্রহণ ভাবধারাও এই পর্যায়েরই মনস্তত্ত্বের যৌগিক অংশ। এ পর্যায়ে আমাদের আকীদা-বিশ্বাসই হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তার ভূমিকা মনস্তত্ত্ব গঠনের সমধিক তীব্র ও প্রচণ্ড প্রভাবে অধিকারী। কেননা মনস্তত্ত্বের যতগুলো যৌগিক অংশ রয়েছে, তার সবকিছুর উপর আকীদা-বিশ্বাসের আধিপত্য ও প্রাধান্য অবশ্য অবশ্য স্বীকৃতব্য। অন্যান্য সব অংশই তার অধীনে থেকে নিজের নিজের কাজ করে। এমন কি, আমাদের স্বভাব-নিহিত ও স্বজ্ঞাজনিত অবস্থাসমূহও তারই প্রভাবাধীন হয়ে থাকে। তার বিরুদ্ধে কখনই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। আমাদের আকীদা-বিশ্বাসে যখন কোন পরিবর্তন সূচিত হয়, তখন তার প্রভাবে সমগ্র মনস্তত্বও পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর আমাদের মনস্তত্ত্বে পরিবর্তন সূচিত হলে বিশ্বলোকের অংশসমূহ ও প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশ সম্পর্কে আমাদের যে প্রতিক্রিয়া ও মতাদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গি, তা সবই আমূল পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

এখানে একটি প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। কোন ধারণা বা কোন জিনিস কিংবা কোন ব্যক্তিসত্তার প্রতি আমাদের মনে 'বিশ্বাস' জন্মে কিভাবে? কোন সব কারণে এই আকীদা দৃঢ়মূল কিংবা দুর্বল হয়?...সে কারণগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার। কেননা সেগুলো যথাযথভাবে নির্ধারিত করা হলেই আমরা নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসকে সঠিকরূপে পড়ে তুলতে পারি। যেহেতু আমাদের আকীদা যথার্থ না হলে—ওপারের ব্যাখ্য থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে

যে,—আমাদের কোন কাজই যথার্থ হবে না। বিজ্ঞানে আমরা যতই উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভ করি না কেন, আমাদের আকীদা বিশ্বাস যথার্থ না হলে একটি সুষ্ঠু আদর্শ ও সৎ সমাজ গঠনের স্বপ্ন আমাদের দ্বারা কখনই সফল ও বাস্তবায়িত হতে পারে না।

সন্ধান প্রবণতা

আমাদের মনস্তত্ত্বে সন্ধান প্রবণতার তীব্র ভাবধারা বর্তমান। আসলে তা একটা অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতামূলক অবস্থা। আর সে অবস্থার উদ্ভব হয় বিশ্বলোক ও বিশ্বলোকের অংশসমূহের প্রকৃত আবস্থা ও রূপ সঠিক ও নির্ভুলভাবে না জানার কারণে। মানুষের মনস্তত্ত্ব নিহিত সন্ধান প্রবণতাই মানুষকে জ্ঞানার্জনে উদ্বুদ্ধ করে। জ্ঞানার্জনের পথে যতই অগ্রগতি লাভ হয়, জ্ঞানের পিপাসা ততই তীব্র হয়ে উঠে, অনুসন্ধান প্রবণতা ততই বুদ্ধি পেয়ে যায়। আর তা থামে না—তৃপ্ত হয় না যতক্ষণ না বিশ্বলোকের অধি বিধ্যা সংক্রান্ত জটিল প্রশ্নাবলীর কোন চূড়ান্ত, অকাট্য ও দৃঢ় প্রত্যয়পূর্ণ জবাব লাভ করা যাবে। বস্তুত প্রকৃতি ঊর্ধ্ব অধিবিদ্যা সংক্রান্ত (metaphysical) সমস্যা ও প্রশ্নাবলী সম্পর্কেই মানব মনে সব সময়ই অসংখ্য জিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে দেখা দেয়। এ বিষয়ে কোন চূড়ান্ত ও অকাট্য স্পষ্ট প্রত্যয়মূলক সমাধান না পেলে বিভিন্ন অনুসন্ধানী নিজ নিজ ধারণা-অনুমানের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তা কখনও নির্ভুল হতে পারে না। তা ছাড়া সে সিদ্ধান্ত বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকম হতেও বাধ্য। এই কারণে অনুসন্ধান প্রবণতারও পূর্ণ তৃপ্তি ও চরিতার্থতা কখনই লাভ হতে পারে না।

কোন জিনিস বা ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধান প্রবণতা চরিতার্থ করার দুটি মাত্র উপায়ই হতে পারে। প্রথম, ব্যক্তি নিজেই সেই জিনিস বা ঘটনা সম্পর্কে পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ চালাবে এবং নিজেই তার বিশেষত্ব ও গুণাগুণের সরাসরি পর্যবেক্ষণ করবে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, সেই বিষয়ে অন্যদের নিকট থেকে শুনবে ও জানবে। কিন্তু শোনা কথা দেখার মত হয় না কখনও। শোনা কথার ব্যাপারে সন্ধান প্রবণতা চরিতার্থ হতে পারে কেবল তখন, যখন এ কথা নিশ্চিতরূপে জানা যাবে যে, বর্ণনাকারী একান্তই সত্যবাদী ও নিঃস্বার্থ এবং জনদরদী—তার এ গুণের কথা ও তার ত্যাগ ও তিতিক্ষা থেকে অকাট্যভাবে জানা যাবে। সেই সঙ্গেই একথাও নিশ্চিতভাবে জানা যাবে যে, যে বিষয়ে সে সংবাদ দিচ্ছে, তার

সাথে তার নিজের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ জড়িত নেই। আরও এই যে, একই ঘটনা বা বিষয়ে যত সংবাদদাতাই সংবাদ দিয়েছে, তাদের সকলের দেয়া সংবাদে পূর্ণ ঐক্য ও সামঞ্জস্য থাকতে হবে। এ কথাও জানতে হবে যে, সংবাদদাতারা যে খবর দিচ্ছে, তার প্রতি তাদের নিজেদেরও পূর্ণ প্রত্যয় রয়েছে। তার প্রমাণ কেবল তাদের মুখের কথায়ই পাওয়া গেলে চলবে না, তাদের বাস্তব অবস্থা থেকেও তার প্রমাণ সুস্পষ্ট হতে হবে।

কোন ঘটনা বা বিষয়ে পরিপূর্ণ প্রত্যয় উদ্রেককারী এ দুটি উপায়ই হতে পারে। এ দুইটি উপায়েই অনুসন্ধান প্রবণতা পূর্ণরূপে চরিতার্থ হতে পারে এবং এমন দৃঢ় প্রত্যয় ও মানসিক প্রশান্তি অর্জিত হতে পারে যে, বিপরীত কথা যত বলিষ্ঠ ভঙ্গিতেই বলা হোক, তা তার প্রত্যয়ের ভিত্তিমূল নাড়াতে পারবে না, এই বিপরীত কথা বিশ্বাস করতে সে কখনই প্রস্তুত হবে না।

অধিবিদ্যা সংক্রান্ত সমস্যা ও বিষয়াদি

বিশ্বলোকের প্রকৃতি-ঊর্ধ্বস্থ অধিবিদ্যা পর্যায়ের বিষয়াদি সহজে মানুষের আয়ত্তাধীন হয় না। কিন্তু সে বিষয়গুলো স্বভাবতই এমন যে, সে সম্পর্কে প্রত্যেকটি মানুষের মন ভাবতে বাধ্য এবং মানব প্রকৃতি সে বিষয়ে পূর্ণ প্রত্যয়যোগ্য সমাধান ও নিশ্চিত জ্ঞান লাভের জন্য সদা উন্মুখ, আকুল। সে বিষয়গুলো এই ঃ

১. বিশ্বলোকের অস্তিত্ব কি করে হল? তা কি কোন অতি-প্রাকৃতিক সত্তা নিজ শক্তিবলে সৃষ্টি করেছে, না 'বস্তু' বা 'জড়ের' বিচিত্র ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত কার্যাবলীর ক্রমবিকাশের ফল?

২. বিশ্বলোক কি কোন আইন-বিধান ও নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে চলছে?....না, এখানে নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন একটা খেলা ও তামাশা চলছে? বিশ্বলোক যদি কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণ করে চলে থাকে, যা লঙ্ঘন করার কোন শক্তিই তার নেই, তাহলে প্রশ্ন জাগে, সে নিয়ম-শৃঙ্খলা রচনাকারীই বা কে এবং এই বিশ্বলোককে সে নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণ করে চলতে বাধ্যই বা কে করেছে?

৩. এই বিশ্বলোক স্বীয় বস্তুগত রূপ লয়ে চিরকাল থেকেই আছে এবং তা চিরকালই কি অক্ষয় হয়ে থাকবে?

৪. এই পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব কি করে সম্ভব হল? এই বিশ্বলোকে তা 'পজিশন' বা মর্যাদা কি? বিশ্বলোক ও তার অন্যান্য অংশের সাথে মানুষের কি সম্পর্ক হওয়া উচিত?

৫. মানুষের এ পার্থিব জীবন ও সত্তা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর কি হবে? এইগুলি এবং এই ধরনের আরও অনেক প্রশ্ন এমন রয়েছে, যা চিন্তাশীল মানুষকে সব সময়ই এবং চিরকালই এ সবের জবাব পাওয়ার জন্যে উদ্বেগ-আকুল করে রেখেছে। ফলে তারা এসব প্রশ্নের জবাব লাভ করার জন্যে—এসব সমস্যার সমাধান করার জন্যে—বিভিন্ন মতবাদ ও মতাদর্শ রচনা করেছে এবং সেসব মতবাদ-মতাদর্শের ভিত্তিতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে এগুলোর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছে। তাদেরই উন্নতমানের চিন্তার ফসল হিসেবে বিদ্যার এক নবতর শাখার ভিত্তি রচিত হয়েছে। বিদ্যার এই নবতর শাখারই নাম হল দর্শন। আর পূর্বোদ্ধৃত প্রশ্নগুলিই হচ্ছে দর্শনের মৌলিক জিজ্ঞাসা ও বুনিয়াদী আলোচ্য বিষয়।

মানুষের ইতিহাসে এমন কোন যুগ আসেনি, যখন তার মনে বিশ্বলোক সম্পর্কিত এসব প্রশ্নের কোন-না-কোন জবাব বর্তমান ছিল না। এসব প্রশ্নের একটা জবাব-সমষ্টি প্রত্যেকটি মানুষের মনেই বর্তমান ছিল—চিরকাল। আর এই জবাব সমষ্টিই ছিল তার দর্শন—জীবন দর্শন। দর্শন পর্যায়ে চিন্তা-গবেষণা চর্চা উৎকর্ষ সাধন ও গ্রন্থ প্রণয়ণের পূর্বে এ প্রশ্নগুলির জবাব মানুষের প্রকৃতির পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। সে জবাবের সারকথা ছিল, বিশ্বলোক স্বতঃই অস্তিত্ব লাভ করেনি, তা সৃষ্টি করা হয়েছে। সৃষ্টি করেছেন বিশ্বলোক-বহির্ভূত কোন মহাশক্তিমান সত্তা। আর সেই মহান সত্তা-ই এই বিশাল বিশ্বলোকের প্রতিটি অণু কণার উপর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব চালাচ্ছেন, তাঁরই রচিত ও জারিকৃত নিয়ম-বিধান মেনে চলতে বাধ্য হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটি অণু-পরমাণু। তাঁর ভয় ও তাঁর অনুগ্রহের স্বীকৃতিমূলক ভাবধারা মানুষের প্রকৃতি নিহিত। এই দর্শনই আধ্যাত্মিক দর্শন বা metaphysics নামে অভিহিত এবং তা বস্তুজগত সংক্রান্ত দর্শন থেকে ভিন্নতর। কিন্তু উত্তরকালে কিছু সংখ্যক চিন্তাবিদ প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশের দিকে মনোনিবেশ করে এবং সেগুলোর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পর্যায়ে গভীর চিন্তা ও গবেষণা শুরু করে দেয়। তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, 'বস্তু' বা 'জড়' ও বস্তুগত শক্তি (material energies) সমূহই বিশ্বলোক ও তার বাহ্য প্রকাশসমূহের আসল উদগাতা। বিশ্বলোকের অন্তরালে কোন সত্তা বা শক্তির

অস্তিত্ব নেই, বিশ্বলোকের উপর তার কোন কর্তৃত্ব বা প্রভুত্ব চলে বলে স্বীকার করার কোন প্রয়োজনই নেই। প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশের জড়বাদী ব্যাখ্যার ফলে যে 'দর্শন' গড়ে ওঠল, তা হচ্ছে নাস্তিক্যবাদী দর্শন (philosphy of atheism)। বস্তুবাদী দর্শন কিংবা জড়বাদ এই দর্শনেরই একটি সংকীর্ণ রূপ। এ অবস্থায়ই দার্শনিক চিন্তা-ভাবনা-চর্চা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। উত্তরকালে এমন কিছু লোক আত্মপ্রকাশ করে, যারা স্বীয় প্রকৃতি নিহিত সাক্ষ্যকেও গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত এবং তারা সে সাক্ষ্যের বুদ্ধিসম্মত ব্যাখ্যাদানেরও প্রয়োজন বোধ করে। নাস্তিক্যবাদী দর্শনের বুদ্ধিসম্মত দলীল-প্রমাণের জবাব দেয়াই ছিল তাদের লক্ষ্য। এসব লোকের চেষ্টার ফলে ধারণাবাদী দর্শনের উদ্ভব হয়। এ দর্শনের ভিত্তি ছিল এ সত্যের উপর স্থাপিত যে, বিশ্বলোকের এক-একটি অণুকণার যা কিছু বিশেষত্ব ও গুণাবলী, তা আসলে মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও তদ্‌জনিত ধারণাবলী মাত্র। মানুষ যদি তা অনুভব না করে, তাহলে সেগুলোর অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভবপর নয়। সারকথা হল, মানুষের ধারণা শক্তিই এসবের অস্তিত্বের উদ্ভাবক। কিন্তু মানুষ নিজে কার ধারণার ফল? সে হচ্ছে সেই বিশ্ব প্রকৃতি অন্তরালবর্তী সত্তার ধারণা কার্যক্রমের ফল। ফলে এই গোটা বিশ্বলোক এমন এক সত্তার ধারনার ফলে অস্তিত্ব লাভ করেছে, যিনি এই বিশ্বলোক থেকে স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন সত্তা।

জ্ঞান-চর্চা ও চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রে নাস্তিক্যবাদ ও আদর্শবাদ (idealim) নামের এই দুটি দর্শনেরই চর্চা চলতে থাকল। এ দুটিরই গর্ভ থেকে জন্ম নিতে থাকল অন্যান্য বহু প্রকারের দর্শন। এর ফলে চিন্তার ক্ষেত্রে একটা দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের ধারাবাহিকতা চলতে থাকল। প্রতিটি মতের অনুসারী স্বগৃহীত দর্শনের অনুকূলে ও বিপরীত দর্শনের বিরুদ্ধতার যুক্তি-প্রমাণ সংগ্রহ করার কাজে ব্যতিব্যস্ত ও বিশেষ কর্মতৎপর হয়ে থাকল। বৈজ্ঞানিক চিন্তা-গবেষণার যুগ সূচিত হওয়ার সময় পর্যন্ত সমগ্র জ্ঞানজগতে এই অবস্থাই অব্যাহত থাকে।

যে সময় থেকে প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশ নিয়ে বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ ধারা শুরু হল এবং তৎলব্ধ ফলাফলকে ভিত্তি করে প্রকল্প ও মতবাদ পর পর সাজানো ও পরম্পরাবিধান শুরু হল, সে সময় থেকেই নাস্তিক্যবাদী দার্শনিকরা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে আলোচনা পর্যালোচনা ও যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন শুরু করে দিল। এভাবে বিজ্ঞানের যতই উন্নতি উৎকর্ষ ও অগ্রগতি হতে থাকল, নিত্য নতুন তত্ত্ব ও উদ্ঘাটিত হতে থাকল,

নাস্তিক্যবাদের এই দর্শন ততটাই বলিষ্ঠ হতে লাগল। বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক রেখেই তারা তাদের বিশেষ দর্শনের চর্চা করত। ফলে তাদের মনের এই অহমিকতা বোধ জাগল যে, মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক-সামষ্টিক জীবনের যাবতীয় সমস্যার প্রকৃত ও বিবেকসম্মত সমাধান কেবল তারাই পেশ করতে সক্ষম। কেবল তারাই পারে এমন একটা জীবন-ব্যবস্থা রচনা করতে, যা মানবতা ও মনুষ্যত্বের উন্নতি সাধনের জন্যে অপরিহার্য। ধর্মের দিক থেকে যা কিছু বলা হচ্ছে, তার সাথে বিবেক বুদ্ধি ও যুক্তি-বিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই। সে সব কথা অনেক পুরাতন এবং সেই কালের উদ্ভাবিত, যখন মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি ছিল নিতান্তই কাঁচা, অপরিপক্ক ও বালসুলভ। বিজ্ঞানের নাম-চিহ্নও তখন ছিল না।

নাস্তিক ও জড়বাদীদের এ অহমিকতা একান্তই বাস্তবতা বঞ্চিত, ভিত্তিহীন। তাদের এ অহমিকতা চূর্ণ করার জন্যে একটা কথাই যথেষ্ট। মানব জীবনের যে পথ স্বয়ং মানুষের মনস্তত্ব ও স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ (consistant) নয়, সে পথ মানবতার ধ্বংস ও বিলুপ্তির দিকে চলে যাবে নিঃসন্দেহে, মানবতার কল্যাণ ও উৎকর্ষ বিধানের দিকে কখনই এবং একদমও যেতে পারে না। এ এক চূড়ান্ত সত্য কথা। তার কারণ, বিশ্বলোকের metaphysics (প্রকৃতি-বহির্ভূত) সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাসমূহের সঠিক ও নির্ভুল সমাধান বের করার ওপরই জীবনের পথ নির্ধারণ একান্তভাবে নির্ভরশীল। আর একথায়ও কোন সন্দেহ নেই যে, এ প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসাসমূহ মানুষের বাস্তব পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের আওতা-বহির্ভূত ব্যাপার। এগুলো কখনই মানুষের বাস্তব অনুভূতির মধ্যে আসে না, আসতে পারে না। এই কারণে নাস্তিক্যবাদী দর্শনের ভিত্তি স্থাপিত যে বিজ্ঞানের ওপর তা এ সব সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। এর ফল এই দাঁড়ায় যে, নাস্তিকদের দিক থেকে এসব প্রশ্ন ও সমস্যার যে সমাধান পেশ করা হয়, তা পুরাপুরি ধারণা-অনুমানমূলক হতে বাধ্য হয় আর ধারণা-অনুমানের কোন স্থিতি নেই বলেই এসব আনুমানিক ও ধারণাগত সমাধানের উপর ভিত্তিশীল জীবন-ব্যবস্থাও কোন স্থায়িত্বই লাভ করতে পারে না।

এই সমস্ত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মতাদর্শ অধ্যয়ন করে মানুষ এক বিশ্রী ধরনের মানসিক দ্বন্দ্বে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। কোনটা প্রকৃত সত্য—আদর্শবাদী দর্শন যা বলে তা, না নাস্তিক্যবাদী দর্শন যা বলে, তার কোন কিছুই তার বোধগম্য হয় না। সে অনেকটা দিশেহারা হয়ে যায়। প্রতিটি দর্শনই নির্ভুল ও

পরম সত্য হওয়ার দাবি করে। অথচ সে সবের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী। তার মধ্যে কোন একটিও জীবন-ব্যবস্থার ভিত্তি হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হতে পারে না। কেননা তার কোনটি বিশ্ব-প্রকৃতি নিহিত ধ্বনির সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন নয়। উভয় দর্শনই দুর্বোধ্য ও দুঃসাধ্য সমস্যাবলী রচনা করে তার সমাধান বের করার উদ্দেশ্যে এমন সব জটিল যুক্তি জালের প্রবর্তন করেছে যে, মানুষের বিবেক-বুদ্ধি সে জালে ফেঁসে গিয়ে শুধু ছট্‌ফট করে নিস্তেজ ও স্তব্ধ হয়ে যেতে বাধ্য হয়।

তবে ওপরে যে অধ্যাত্মবাদী দর্শনের কথা বলা হয়েছে, তা মানব প্রকৃতির সাথে অনেকটা সঙ্গতিসম্পন্ন। কিন্তু তবুও এ কথায় সন্দেহ নেই যে, তা-ও মানুষকে নানা ভিত্তিহীন কুসংস্কারের অন্ধত্বে নিমজ্জিত করতে পারে। পারে, যদি মানুষ বিশ্বলোকের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী না হয়। মানব-প্রকৃতিতেও যে দুর্বলতা রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কেননা যে সত্তা বা বস্তুতে কোন রূপ অস্বাভাবিক শক্তি মানুষ দেখতে পায় বা আছে বলে ধারণা হয় এবং সে সত্তা বা বস্তুর আসল পরিচয় তার অবিদিত থাকে, তাহলে মানুষ তারই সামনে চরম বিনয় ও আনুগত্যের মস্তক অবনমিত করে দেয়। তার প্রতি ঠিক সেই রূপ আচরণ অবলম্বন করতে শুরু করে দেয়, যেমন আচরণ আল্লাহ্‌র সাথে করা বাঞ্ছনীয়। মানব-প্রকৃতির এই অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। বিশ্বলোকের বিভিন্ন অংশকে আল্লাহ্‌রূপে গ্রহণ করা মানবেতিহাসে কোন বিরল বা অঘটিত কাহিনী নয়। আজও—বিশ শতকের এই বিজ্ঞানের চরমন্নোতির যুগেও চন্দ্র ও সূর্যকে দুনিয়ার কোন কোন জাতি খোদা বা দেবতা বানিয়ে রেখেছে ও পূজা করছে। ফেরেশতা, নবী-রাসূল, আলী-দরবেশ-পীর প্রভৃতিকে খোদায়ী গুণে গুণান্বিত আজও ধারণা করা হচ্ছে। আজও তাদেরকে খোদায়ী ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে। আধ্যাত্মিক দর্শন অনুসরণের ফলে অন্ধ কুসংস্কারে নিমজ্জিত হওয়ার এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি মাত্র উপায়ই রয়েছে। আর তা হল এ অধ্যাত্মবাদী দর্শনের শিক্ষা দান করা হবে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের শিক্ষাও দেয়া হবে। মানুষ যেসব কারণে বিশ্বলোকের বিভিন্ন অংশের পূজা-উপাসনা শুরু করে দেয়, বিজ্ঞানের নির্ভুল জ্ঞান শিক্ষা দানের ফলে মানব মন থেকে সে সব কারণ নির্মূল হয়ে যাবে এবং মনে মনস্তত্ত্বে এমন তওহীদী ভাবধারা জাগ্রত হবে, যার ফলে সে কোন দিনই কোন অখোদার আরাধনা ও উপাসনায় লিপ্ত হতে প্রস্তুত হবে না।

জীবন-ব্যবস্থার আল্লাহ্ প্রদত্ত দর্শন

যে দর্শন মানব প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, কোন যুক্তি বা প্রমাণ দিয়েই যার প্রতিবাদ করা সম্ভব হয় না, যে দর্শনে মানুষের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ-সম্ভাবনা নিহিত, কেবলমাত্র তা-ই হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত দর্শন। ইতিপূর্বেকার বিস্তারিত আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এরূপ একটি দর্শন মানুষের চিন্তা-কল্পনা-গবেষণার ফল হতে পারে না কখনও। এ আল্লাহ্ প্রদত্ত দর্শন (প্রকৃতি-বহির্ভূত ও অধিবিদ্যা সংক্রান্ত সমস্যাবলীর সমাধান) প্রকৃত ও স্থায়ী বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। মানবতার কল্যাণ এ দর্শন দ্বারাই সম্ভবপর। একটি আদর্শ, নিখুঁত ও কল্যাণকর সমাজের ভিত্তি এ দর্শন থেকেই পাওয়া যেতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলার কালাম কুরআন মজীদ থেকে যেমন জানা যায়, মানুষের মগজ সমস্ত প্রাকৃতিক (natural and physical) জ্ঞানের ভাণ্ডার-এ পর্যন্তকার দীর্ঘ আলোচনায় তারই বিস্তারিত ব্যাখ্যাদান করা হয়েছে—সেই সঙ্গে কুরআনে একথাও স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিশেষভাবে প্রেরিত বান্দাদের মাধ্যমে প্রকৃতি-বহির্ভূত সমস্যাদির (metaphysical problems) সমাধান প্রত্যেক যুগে ও কালে এবং প্রত্যেক জাতির নিকট পেশ করার সুষ্ঠু ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করেছেন মানব সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই। বিশেষভাবে নিয়োজিত এ লোকগণ যেমন চরিত্রের দিক দিয়ে ছিলেন নিষ্কলুষ, তেমনি সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত বৈষয়িক স্বার্থ ও মুনাফালাভের সম্পূর্ণ উর্ধ্বে। এঁদের মাধ্যমে যে জ্ঞান পাঠানো হয়েছে, তা প্রাকৃতিক জগত সংক্রান্ত তত্ত্ব ও তথ্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি-বহির্ভূত জগত সংক্রান্ত জ্ঞানেরও ভাণ্ডার ছিল এবং প্রকৃতি-বহির্ভূত জগত সংক্রান্ত সমস্যাদির সুষ্ঠু সমাধানও তাতেই রয়েছে। আল্লাহ্র কালামে এই পর্যায়ের জ্ঞানকে বলা হয়েছে 'গায়ব'। 'গায়ব' সংক্রান্ত এসব কথা সম্পর্কে আমাদের অনুসন্ধান প্রবণতা ও আবেগকে চরিতার্থ না করা পর্যন্ত আমাদের হৃদয়ের পরিপূর্ণ আশ্বস্তি ও পরিতৃপ্তি সাধিত হবে না। দূর হবে না আমাদের মন-মগজের উদ্বেগ ও অস্থিরতা। 'গায়ব' সম্পর্কে মানুষের মন ও মগজের পূর্ণমাত্রায় আশ্বস্ত, প্রশান্ত ও পরিতৃপ্ত হওয়াকেই বলা হয় ঈমান গ্রহণ। 'গায়ব' সংক্রান্ত এই কথাবার্তার ওপর আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়ই আমাদের মনস্তত্ত্বের

আসল নিয়ামক—নিয়ন্ত্রক। গায়বের প্রতি আমাদের ঈমান যেরূপ হবে, আমাদের সমগ্র মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা ও ভাবধারাও ঠিক সেই রকমই হবে। সেই অনুপাতে হবে বিশ্বলোক ও বিশ্বলোকের বিভিন্ন অংশের সাথে আমাদের বাস্তব আচরণ। যেমন, মৃত্যুর পর আমাদের অস্তিত্ব নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং অতপর আর কিছুই নেই—এই যদি আমাদের ঈমান হয়, তাহলে আমাদের বাস্তব আচরণ গড়ে ওঠবে। এই অনুযায়ী তখন আমরা এই পার্থিব জীবনকে বেশী বেশী সুখী, শান্তিপূর্ণ ও উন্নতমানের করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হব। আমরা অন্যান্যের তুলনায় উত্তম খাদ্য, পোশাক ও বাসস্থান গ্রহণে উদ্যোগী হব, বেশী বেশী ধন-সম্পদ অর্জনে সর্বশক্তি নিয়োজিত করব, জীবনের সুখ-সম্ভোগের জন্যে বেশী বেশী দ্রব্য-সামগ্রী হস্তগত করতে সচেষ্ট হব, আমাদের বেশী বেশী প্রভাব-প্রতিপত্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করব এবং এই সবের কোন কিছু অন্য লোকেরা পেল কি পেল না, অন্য লোকদের কি চরম দুঃখ-দুদর্শা হল, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করব না, সেজন্য একবিন্দু চিন্তা করারও প্রয়োজন অনুভব করব না। আমরা চাইব, আমাদের কথামতই গোটা জাতি চলুক, প্রতিটি লোক আমাদের অঙ্গুলি হেলনে উঠুক আর বসুক। আমাদের মর্জীই হোক আমাদের দেশের ও সমাজের একমাত্র নিয়ামক। এখানে 'আমরা' আর 'আমাদের' বলতে যাদের বোঝায়, তাদের ছাড়াও দেশে ও সমাজে অনুরূপ চিন্তা-বিশ্বাসের ও অনুরূপ ইচ্ছা কামনা-বাসনা পোষণকারী হাজার হাজার ও লক্ষ লক্ষ লোক থাকবে। তারাও 'আমাদের' মতো করতে চাইবে, করবে এবং করার অধিকার তাদেরও তেমনি রয়েছে, যেমন আমাদের। তখন প্রতিটি ব্যক্তিই নিজ নিজ অধিকার আদায়ের জন্যে চেষ্টা-সাধনা ও সংগ্রামে লিপ্ত হবে, প্রত্যেকেই 'প্রাকৃতিক নির্বাচনে (natural selection) উদ্বর্তন লাভের জন্যে উঠে-পড়ে লেগে যাবে। তখন সারাটি পৃথিবীব্যাপী ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, সমাজে সমাজে, জাতিতে-জাতিতে ও রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে যে চরম নির্বিচার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাবে এবং তার ফলে যে সর্বাত্মক ভাঙ্গন ও বিপর্যয় শুরু হয়ে যাবে, আর তার অনিবার্য পরিণতিতে গোটা মানবতাই যে ধ্বংস হয়ে যাবে তাতে আর কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। কেননা এরূপ অবস্থা মোটেই স্বাভাবিক নয়, নয় বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই বিপর্যয় অনিবার্য, অবধারিত।

কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যদি এই হয় যে, মৃত্যুর পর আমাদের দৈহিক বিনাশ হলেও জীবনের অবসান ঘটে না। আমরা তখন বেঁচে থাকি নতুন রূপে নতুন আঙ্গিকে এবং সে বাঁচা চিরন্তনের তরে বাঁচা। সে বাঁচার কোন লয় নেই, বিনাশ

নেই। কিন্তু সে পরকালীন জীবনটা আমাদের ইহ্কালীন জীবনের ঈমান ও বাস্তব আচার-আচরণের ফল হিসেবে ভালোও হতে পারে, মন্দও হতে পারে; তাহলে আমরা ইহকালের ক্ষণিক ও সীমাবদ্ধ জীবনের তুলনায় পরকালীন জীবনকেই অধিক গুরুত্ব দেব, দেব সর্বাধিক অগ্রাধিকার। সে জীবনকে উত্তম, উন্নত ও সুখ-শান্তিময় বানাবার জন্যেই নিয়োজিত হবে আমাদের সব চিন্তা ভাবনা, চেষ্টা-প্রচেষ্টা। এভাবে যত বেশী সংখ্যক লোক তাদের পরকালীন জীবনকে সুখময় বানাবার চিন্তায় ব্যাকুল হবে, আমাদের এখানকার সমাজ ও রাষ্ট্রও ততই গঠনমূলক চিন্তা ও আচরণের অনুসারী হবে। বিপর্যয় ও অশান্তির কারণ খুব কমই ঘটবে। ফলে বিশ্বমানবতার সঠিক উন্নতি লাভের পথ উন্মুক্ত হবে।

বন্দেগী কবুলের আবেগ ও প্রবণতা

মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি ও মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন একথাও আমাদের জানিয়ে দেয় যে, কোন লোক যখন কোন জিনিস বা ব্যক্তিসত্তা (তা নিজের জ্ঞান অনুপাতে) অসাধারণ ও অস্বাভাবিক শক্তির সৌন্দর্য দেখতে পায় কিংবা আছে বলে ধারণা করে, আর নিজের উপর তার এতটা প্রভাব গ্রহণ করে যে, নিজের জীবনের স্থিতি, জীবন-সামগ্রী লাভ ও সর্বপ্রকার লাভ-লোকসান সেই জিনিস বা সেই ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত করে দেয় তারই অবদান বলে মনে করে নেয়। তখন তার মনে-হৃদয়ে গভীর কৃতজ্ঞতার ভাবধারা তীব্রভাবে জেগে উঠে সেই জিনিস বা ব্যক্তিসত্তার প্রতি। তারই ফলে সে তারই সম্মুখে আনুগত্যের মস্তক অবনমিত করে দেয়। আর কারোর নিকট মাথা নত করে দেয়া এমন একটা অকাট্য স্পষ্ট নিদর্শন যে, তা থেকেই বুঝতে পারা যায় ঃ সে তার দাসত্ব স্বীকার করছে অকুণ্ঠিতভাবে। সে তারই আনুগত্য ও অধীনতার রজ্জু দিয়ে নিজের গলদেশকে বেঁধে নিয়েছে বলেই এই কথায় আর কোনই সন্দেহ থাকে না। এরূপ অবস্থায় তারই মর্জী অনুযায়ী চলতে সে স্বতঃই প্রস্তুত হয়ে যায়। সে-ই হয় তখন তার পরিচালক—নিয়ন্ত্রক। তখন তার চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসীন হয় সেই জিনিস বা ব্যক্তিসত্তা। সে তার অনুগ্রহ স্বীকার করার ও তাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপই গ্রহণ করবে, সব আচার-অনুষ্ঠান স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পালন করবে। তার জন্যে স্বীয় শ্রমার্জিত ধন-মালও অকাতরে কুরবান করে দেবে, সেজন্যে সর্ব রকমের ত্যাগ স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত হবে না। মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে এ কথা অকাট্য ও সত্য। বস্তুত এই রূপ সত্তাকেই মানুষ 'আল্লাহ্' বলে। কুরআনের ভাষায় এই সত্তা-ই 'ইলাহ্' এবং মা'বুদ। মানুষ স্বীয় হৃদয়

নিহিত বন্দেগী কবুলের আবেগ ও প্রবণতা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জিনিস বা সত্তাকে খোদা বানিয়েছে। উপরন্তু চতুর ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা মানুষের প্রকৃতি নিহিত হৃদয়াবেগকে হাতিয়ার বানিয়ে গোষ্ঠী-সমাজ ও জাতির ওপর নিজের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব স্থাপন করে নিয়েছে। রাজাদের রাজত্ব, বাদশাহ্‌দের বাদশাহী, সম্রাটদের সাম্রাজ্য, ডিকটেটরদের ডিকটেটরী প্রভৃতি ব্যবস্থা মানুষের প্রকৃতি নিহিত এই বন্দেগী কবুলের ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানবেতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে। আর বর্তমান যুগে স্বদেশ ও দেশমাতৃকাই হচ্ছে বড় খোদা। জাতিকে বানিয়েছে তার স্থলাভিষিক্ত—প্রতিনিধি। জাতির ইচ্ছাই হচ্ছে জাতির ব্যক্তিদের শাসক ও নিয়ামক। প্রতিটি মাতৃভূমি নাগরিকদের প্রধান খোদা হয়ে বসেছে। প্রত্যেক নাগরিক তার নিজের স্বদেশ বা দেশমাতৃকার জন্যে নিজের যথাসর্বস্ব—জান-প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। স্বীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিজের দেশমাতৃকার প্রেমে বিলীন করে দিতে, স্বীয় আত্মসম্ভ্রম—আত্মচেতনাকে পর্যন্ত জাতি ও জাতির নেতৃবৃন্দের মর্জীর অধীন করে দিতে বাধ্য। এভাবে সারাটি পৃথিবী বিভিন্ন খোদার খোদায়ীতে বিভক্ত হয়ে আছে বর্তমানে। প্রত্যেক খোদা-ই অন্যদের উপর স্বীয় নিরংকুশ খোদায়ী প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট। নিজেদের চিন্তা-গবেষণার প্রভাব প্রতিপত্তি সাধারণ জনমানুষের মনে-মগজে বসিয়ে স্বীয় প্রাধান্য ও বড়ত্বের বড়াই কায়েম করতে চাচ্ছে মাত্র।

আল্লাহ্‌ প্রদত্ত জীবন-ব্যবস্থার ভিত্তি

কিন্তু মানুষ বন্দেগী কবুলের এই আবেগ ও প্রবণতার দরুন কেন এত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করল? কখনও আকাশমার্গীয় অবয়ব—চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারাকে নিজের মা'বুদ বানায় কখনও নদী-সমুদ্র-পাহাড়-পর্বত, কখনও দেশ ও রাষ্ট্রকে, আবার কখনও কোন বস্তুকে?......এ বিষয়ে চিন্তাবিদদের—বিশেষ করে মানবীয় মনস্তত্ত্ব বিশারদদের—গভীর ভাবে ও গুরুত্ব সহকারে চিন্তা-বিবেচনা করা আবশ্যক। স্পষ্ট মনে হয়, প্রকৃত মা'বুদের সন্ধানেই মানুষের এই সুদীর্ঘ পিচ্ছিল পথের পরিক্রমা। অজ্ঞানতার কারণে সে এক-এক সময় এক-একটি জিনিস বা সত্তাকে খোদার আসনে আসীন করে নিয়েছে। খোদা রূপে বরণ করেছে কিংবা মনে করেছে আসল খোদার প্রতীক, প্রতিবিম্ব। মানব-প্রকৃতি নিহিত মা'বুদ সন্ধানের এ আবেগ ও প্রবণতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, একজন সত্যিকার মাবুদ অবশ্যই হওয়া উচিত। সে সন্ধান করে প্রকৃত মা'বুদকে। অজ্ঞানতার কারণে সে অনেক সময় অ-খোদাকে খোদা এবং অপ্রকৃত মা'বুদকে মা'বুদ বা উপাস্য বানিয়েছে অনেক সময়, অনেকবার। কিন্তু প্রকৃত মা'বুদের সন্ধান তার

শেষ হয়ে যায়নি। কেননা সে প্রকৃত মাবুদকে এখানো পায়নি। যে মা'বুদকে পেলে মানুষের এ অনুসন্ধান প্রবণতা ও আবেগের বিতৃপ্তি ঘটবে, হবে পূর্ণ মাত্রায় চরিতার্থ, সার্থক ও কৃতার্থ বোধ করবে, বুঝতে বে, সে-ই হচ্ছে তার প্রকৃত মাবুদ। মানুষ কেবল একটি মাত্র সত্তাকেই মা'বুদ রূপে গ্রহণ করতে পারে। এ উপায়ে সে যখন একজনকে মা'বুদ রূপে গ্রহণ করবে, সেই গ্রহণের ফলে তার এই সন্ধান প্রবণতা পরিতৃপ্ত ও কৃতার্থ হবে। অন্যাথায় অ-প্রকৃত খোদাকে আল্লাহ্ রূপে গ্রহণ করলে এই প্রবণতা ও হৃদয়াবেগ পরিতৃপ্তও হবে না, স্তব্ধও হবে না। আল্লাহ তা'আলা মানব-প্রকৃতিতে বন্দেগী কবুলের এই প্রবণতা ও আবেগ রেখে দিয়েছেন এ উদ্দেশ্যে যে, মানুষ প্রকৃত আল্লাহ্র বন্দেগী করবে। আর অনুসন্ধান প্রবণতা রেখেছেন এ উদ্দেশ্যে যে, মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির বাহ্য প্রকাশ সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করবে, যেন প্রকৃত মাবুদের প্রতি এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য গায়বী জিনিসের প্রতি গভীর প্রত্যয় লাভ করে এবং প্রকৃত মা'বুদকে বাদ দিয়ে বাতিল মা'বুদের সন্ধানে উদ্ভ্রান্ত হয়ে না যায়।

পূর্বেই বলেছি, মানুষের মনস্তত্ত্বের নিয়ামক-নিয়ন্ত্রক অংশ হল তার ঈমান ও আকীদা। তার বাস্তব আচরণ হয় তার-ই অধীন, তার-ই অনুগত। আর সেই ঈমানও গায়বী বিষয়াদির প্রতি, যার প্রত্যক্ষ অনুভূতি সে কখনও লাভ করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলার নাযিল করা জীবন-দর্শন এবং তার ভিত্তিতে রচিত জীবন-ব্যবস্থার অধীন থেকেই মানুষের ব্যক্তিত্বের সঠিক বিকাশ লাভ সম্ভবপর। মানুষের মনুষ্যত্বের প্রকৃত কল্যাণ এই জীবন ব্যবস্থার সাথেই জড়িত—এ জীবন-বিধানের উপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল।

সূরা আল-বাকারার প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত

কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্যে কয়েকটি জরুরী শর্ত রয়েছে। এই শর্তসমূহ সূরা আল-বাকারার প্রাথমিক কয়েকটি আয়াতে উদ্ধৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণা হল ঃ যারাই এসব শর্ত পূর্ণরূপে পালন ও পূরণ করবে, তারাই আল্লাহ্র দেয়া এ জীবন-ব্যবস্থার অনুসরণ ও বাস্তবায়নে সক্ষম হবে। সূরা আল-বাকারার নিম্নোদ্ধৃত প্রাথমিক আয়াত কয়টিতে এ শর্তসমূহ অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষা ও ভঙ্গীতে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আল-বাকারার সেই প্রাথমিক আয়াত কয়টিতে বলা হয়েছে ঃ

১. ইহা আল্লাহ্র নাযিল করা কিতাব। এতে কোনরূপ সন্দেহ নেই।

২. ইহা হেদায়েত সেসব আল্লাহ্-ভীরু লোকদের জন্যে।

৩. যারা গায়বের প্রতি ঈমান আনে,

৪. নামায কায়েম করে,

৫. আমরা যে রিযিক তোমাদের দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় ও ব্যবহার করে।

৬. যে কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করেছি এবং সে-সব কিতাব তোমার পূর্বে নাযিল করেছি সেই সব কিতাবের প্রতি ঈমান রাখে,

৭. এবং পরকালের প্রতি 'ইয়াকীন'—দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করে।

৮. এই লোকেরাই তাদের আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আসা হেদায়েতের অনুসারী এবং তারাই কল্যাণপ্রাপ্ত।

ব্যাখ্যা

১. আল্লাহ্‌র এই কিতাব বিশ্বমানবের জন্যে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে নাযিল হয়েছে। বিশ্বলোক-স্রষ্টা ও প্রকৃত মা'বুদ আল্লাহ্‌রই নাযিল করা এই কিতাব—এতে কোন সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই এতে বলা কথা ও তত্ত্ব ও তথ্যের সত্যতা ও যথার্থতা সম্পর্কে। তার প্রতিটি অংশই সত্য ও যথার্থ এবং প্রকৃত অবস্থার সাথে পুরা মাত্রায় সঙ্গতিপূর্ণ।

২. 'আল্লাহ্-ভীরু লোক' বলতে বোঝায় সেই লোকদের, যাদের মনে হৃদয়ে আল্লাহ্‌র অসন্তোষ ও পরকালীন আযাবের ভয় তীব্রভাবে বর্তমান এবং তার-ই কারণে প্রকৃতি ও স্বভাবগত আকর্ষণ ও আসক্তি থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে দূরে সরে থাকে এবং সচেতন প্রবণতা সহকারে আল্লাহ্‌র সন্তোষমূলক কাজকর্মে লিপ্ত থাকে। এই গুণ যাদের রয়েছে তারাই 'মুত্তাকী' বা 'পরহেযগার' বলে অভিহিত। তারা মনের অশুভ ও অবৈধ লালসা-কামনা ও ইচ্ছা-বাসনার চরিতার্থতায় লেগে যায় না। বরং কুরআনের দেয়া নীতি আদর্শ অনুসরণ করে চলার সচেতন প্রচেষ্টা এবং উচ্চতর লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে নফস্ বা নফসের কামনা-বাসনার দাসত্ব করতে তারা অস্বীকার করে। এ কারণে তাদের বলা যায় 'আদর্শবাদী ও মহান উদ্দেশ্যে নিবেদিত লোক'। এরই বিপরীত লোক হচ্ছে তারা, যারা 'নীতিহীন' 'আদর্শহীন' ও 'লালসার দাস'।

কুরআনের ঘোষণা—'ইহা হেদায়েত সেই আল্লাহ্-ভীরু লোকদের জন্যে, যারা গায়বের প্রতি ঈমানদার'—থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, মানব প্রকৃতিতে আল্লাহ্‌র ভয় ও নির্ভয়তা—উভয় ভাবধারাই রয়েছে, থাকা স্বাভাবিক। তবে যাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় প্রবল ও বিজয়ী কেবল সে সব লোকই 'মুত্তাকী' আদর্শবাদী' ও

উন্নত চরিত্রের অধিকারী বলে গণ্য হয়। পক্ষান্তরে যাদের মনে আল্লাহ ভয়ের পরিবর্তে লালসা-কামনা পূজার ভাব প্রবল ও বিজয়ী, তারাই আদর্শহীন ও চরিত্রহীন।

এ থেকে এ কথাও সুস্পষ্ট হয় যে, লালসা-কামনার অনুসারী লোকেরা আল্লাহ্র হেদায়েত অনুসরণ করে চলতে পারে না। এই কারণে তাদের ছাটাই করে আলাদা করে দেয়া হয়েছে। কেবলমাত্র আদর্শবাদী লোকেরাই আল্লাহ্র বিধান মেনে চলতে সক্ষম। এই কারণে এ আয়াতে সেই আদর্শবাদীদের সম্বোধন করেই কথা বলা হয়েছে এবং তাদের সামনে পরবর্তী শর্তসমূহ পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কেবলমাত্র সেই আদর্শবাদী লোকেরাই আল্লাহ্র বিধান মেনে চলতে পারে, যারা এ শর্তগুলো মেনে নেবে। এ শর্তগুলো পুরা না করলে যত বড় আদর্শবাদী লোকই হোক-না কেন, আল্লাহ্র কিতাব থেকে হেদায়েত লাভ করা সম্ভবপর হবে না।

৩. প্রথম শর্ত হল 'গায়ব'-এর প্রতি ঈমান। এর ফলেই মানুষের প্রকৃতি নিহিত অনুসন্ধান প্রবণতা চরিতার্থ হয়।

৪. দ্বিতীয় শর্ত নামায কায়েম করা। বন্দেগী কবুলের আবেগ ও প্রবণতা এই নামায দ্বারাই পূর্ণ মাত্রায় পরিতৃপ্ত হয়। পূর্ববর্তী দীর্ঘ আলোচনা-বিশ্লেষণে একথা সুস্পষ্ট করে তোলা হয়েছে যে, যে সত্তার দ্বারা মানুষের বন্দেগী কবুলের আবেগ ও প্রবণতার পরিতৃপ্তি ও চরিতার্থতা সাধিত হয়, মানুষ সেই সত্তারই দাসানুদাস হয়ে যায়। তার সন্তোষ বিধানের জন্যে সে নানাবিধ পন্থা ও উপায় অবলম্বন করে। নামায হচ্ছে ইবাদতের এমন একটা পন্থা যা স্বয়ং প্রকৃত মা'বুদ মানুষের প্রকৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। বন্দেগী কবুলের আবেগ ও প্রবণতা-ভাবধারা যতটা মাত্রায় সান্তনা ও পরিতৃপ্তি লাভ করে এই নামাযের মাধ্যমে, ততটা অপর কোন ধরনের ইবাদতেই পাওয়া যায় না। উপরন্তু নামাযে শুধু বন্দেগী কবুলের হৃদয়াবেগই পরিতৃপ্তি পায় না, সেই সঙ্গে প্রকৃত মা'বুদের মূল সত্তা ও মহান গুণাবলীর ধারণা প্রকট হতে হতে মানুষের চেতনায় আল্লাহ্র সত্তা এতটা প্রকট হয়ে পড়ে যে, মানুষ প্রতি মুহূর্তেই তাঁর অস্তিত্ব ও উপস্থিতি অনুভব করতে শুরু করে। আর বস্তুত নামাযের এই কড়া শর্ত আরোপের মূল লক্ষ্যও হচ্ছে বান্দার মন-মানসিকতার এরূপ অবস্থা লাভ। এ কারণে নামায এমন একটা ইবাদত, যা কোন অবস্থায়ই উপেক্ষিত বা পরিত্যক্ত হতে পারে না। মানুষ যদি আল্লাহ্র সত্তার গোলামীতে নিজের সমস্ত ইবাদত-ইখতিয়ার সম্পূর্ণ

রূপে উৎসর্গ করে দিয়ে থাকে এবং তার ফলে তার চেতনায় আল্লাহ্‌র সত্তা এমন ভাবে দৃঢ়মূল হয়ে বসে যে, প্রতি মুহূর্ত তাঁর উপস্থিতিকে তীব্রভাবে অনুভব করতে পারে, তাহলে মানুষ তখন কেবলমাত্র সেই কাজ-ই করবে—সেই সব কাজই করবে, যা তার মা'বুদের সন্তোষ বিধানের জন্যেই জরুরী হবে। পক্ষান্তরে সে এমন সব কাজ থেকেই বিরত থাকবে, যা তাঁর মর্জীর পরিপন্থী হবে। আল্লাহ্‌র নাযিল করা জীবন বিধানের এ-ই হচ্ছে প্রকৃত তাৎপর্য।

এই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা থেকে এ কথাও জানা গেল যে, মানুষ স্বভাবতই সেসব নিয়ম-বিধান ও আইন-আদেশ অন্তর থেকে পালন করে, সে সবের রচয়িতার সঙ্গে তার বন্দেগীর সম্পর্ক স্থাপিত—যাকে সে নিজের একমাত্র মা'বুদ রূপে গ্রহণ করেছে এবং নিজেকে মনে করেছে একমাত্র তাঁরই বান্দা ও গোলাম। কোন ব্যক্তির বা জাতির রচিত আইন-বিধান লোকদের দ্বারা বস্তুগত শক্তির চাপে ও দাপটে কিছু-না-কিছু পালন করানো যায় বটে; তবে মানুষ অন্তর দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা কস্মিনকালেও পালন করে না—করতে পারে না। সেই বস্তুগত শক্তির দাপট বা চাপ যে মুহূর্তে হ্রাস পাবে কিংবা কিছুটা শিথিল হয়ে পড়বে, তখন সমগ্র সমাজে একটা ব্যাপক বিপর্যয় সূচিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। দুনিয়ার ডিকটেটরী স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার আকস্মিক অবসানের পর বিভিন্ন জাতির জীবনে যে ব্যাপক ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা গেছে, তার সঠিক ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য এই।

নামায কায়েম করার শর্তে নামাযের দো'আ-কালামসমূহ তোতা পাখীর মত কেবল মুখে আওড়ানোর কথাই বলা হয়নি, বরং তা যথার্থ শুদ্ধতার সঙ্গে পাঠ করতে হবে যেমন, তেমনি তার অর্থ ও ভাবধারার প্রভাব হৃদয় ও মনের উপর শক্তভাবে বসাতেও হবে। স্বতঃপ্রবৃত্ত ও উদ্যোগী-সচেতনভাবে সে প্রভাবকে অন্তর দিয়ে কবুলও করতে হবে। সেই সঙ্গে নামায পড়তে হবে নামাযের জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে এবং জামা'আতের সাথে। জামা'আতের নামায ব্যক্তির হৃদয়-মনের উপর যতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে, একাকী নামায ততটা পারে না। নামায কায়েম করার শর্তে সর্বশেষ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, মুখে যা কিছু উচ্চারণ করা হবে, তার প্রভাব স্বীয় মন-মগজে গ্রহণ করতে হবে এবং নিজের আমল-বাস্তব আচার—আচরণ ও কাজকর্মের মাধ্যমেও তাকে রূপায়িত ও প্রকাশমান করে তুলতে হবে। বস্তুত পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত ও সময়ানুবর্তিতা সহকারে পড়া হলে মানুষের দৈনন্দিন কার্যাবলীতেও নিয়মানুবর্তিতা এ সুষ্ঠুতা আসবে। মানুষের স্বভাবগত ও নৈতিক অবস্থাকে সুষ্ঠু

নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্যে এ জিনিসটির অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। জামা'আতের সাথে নামায পড়ায় ব্যক্তিদের মধ্যে সামাজিক-সামষ্টিক ভাবধারা জেগে উঠে। তার ফলে বহু বে-নামাযী লোকও নামায পড়তে ইচ্ছুক ও অনুপ্রাণিত হয়।

নামায লব্ধ ভাবধারা আমলের মাধ্যমে রূপায়িত করার তাৎপর্য হল, যা মুখে পড়া হবে, বাস্তবে তদনুযায়ী কাজও করা হবে। সমস্ত জীবনকে সেই অনুপাতে গড়ে তোলা হবে। নামাযে আমরা পড়ি ঃ

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ

হে আল্লাহ্! আমরা কেবল মাত্র তোমারই বন্দেগী করি এবং কেবল তোমার নিকট সাহায্য চাই।

নিজের আমলের মাধ্যমে এই কথাটির সত্যতা-যথার্থতা প্রকটিত হয়ে উঠতে হবে অর্থাৎ ঈমানদার লোকেরা কার্যত এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোর বন্দেগী করবে না। আর কারোর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে সে কোন কাজই করবে না। নিজেদের জীবনে কেবল সেই কাজই করবে, যা আল্লাহ্ চাহেন—যা করার ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি আমরা নামাযের মাধ্যমে দেই। আমাদের জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগ আল্লাহ্র বিধান মুতাবিক গড়ে তুলতে হবে। অন্য কথায় আল্লাহ্র দেয়া জীবন-দর্শন ও জীবন ব্যবস্থাকে আমাদের নিজেদের উপর এবং সমগ্র বিশ্বমানবের উপর কার্যকর ও বাস্তবায়িত করার জন্যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাতে হবে। অন্য কথায় নামায কায়েম করার তাৎপর্য হল আল্লাহ্র দ্বীন কায়েম করা।

৫. 'রিযিক' ব্যয় করার ফলে ব্যয়কারী অন্তর-মনে সাধারণ মানবতার প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতার ভাবধারা শক্তি লাভ করে। তার ক্রমবর্ধন ও বিকাশ ঘটে। স্বার্থপরতা ও আত্মসর্বস্বতা মূলোৎপাটিত হয়। এই স্বার্থপরতা ও আত্মসর্বস্বতাই মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সহানুভূতি ও সহমর্মিতা যতটা বৃদ্ধি পাবে, আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী কাজ করার প্রবণতা ও যোগ্যতা ততটাই বাড়বে। এ আয়াতে এ কথা বলা হয়নি যে, আল্লাহ্র দেয়া রিযিক ভাল ভাল কাজে ব্যয় করতে হবে। কেবলমাত্র ব্যয় করার কথাই বলা হয়েছে। কোথায়, কোন্ কাজে, তা নির্দেশ করা হয়নি এ আয়াতটিতে। এখানে 'ভাল ভাল কাজে ব্যয় করা' বলার কোন প্রয়োজনও ছিল না। কেননা যে লোকদের সামনে এই শর্তটি পেশ করা হয়েছে, তারা তো স্বতঃই আদর্শবাদী লোক, পরহেযগার লোক। তারা মনের লালসা-কামনার জন্যে নিজেদের শ্রমার্জিত অর্থ ও সম্পদ ব্যয় করার লোক নয়। কাজেই তারা নিজেরাই

সেসব কাজে আল্লাহ্‌র রিযিক ব্যয় করবে না, জীবনের মহান আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সাথে যার কোন সম্পর্ক বা সঙ্গতি নেই।

৬. সব আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান রাখার শর্ত করা হয়েছে। প্রথমত, কুরআনের প্রতি দৃঢ় ও সংশয়হীন ঈমান না থাকলে—তাকে আল্লাহ্‌র কিতাব বলে বিশ্বাস না করলে, তাতে যা কিছু বলা হয়েছে তাকে জীবনের অটল ও অপরিবর্তনীয় বিধান বলে বিশ্বাস না করলে পূর্ণ নিশ্চিন্ততা সহকারে তদানুযায়ী আমল করা সম্ভব হবে না। আর তা না হলে জীবন কখনও সুন্দর, নির্মল ও উন্নত হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, কুরআনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সব আসমানী কিতাবকেও সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে। এ কিতাবসমূহ বিভিন্ন সময়ে দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির প্রতি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নাযিল হয়েছিল। এইসব কিতাবেই বলা মৌলিক ও নীতিগত কথা এক ও অভিন্ন। আর যেসব লোকের প্রতি এই কিতাবসমূহ নাযিল হয়েছিল, তাঁদের চরিত্রও ছিল নির্মল নিষ্কলুষ এবং তাঁরা ছিলেন ব্যক্তিগত ও বৈষয়িক স্বার্থবাদের অনেক ঊর্ধ্বে। কুরআনের পরিভাষায় তাঁরা সকলেই মাসুম—সর্ব প্রকার পাপ-না-ফরমানী থেকে পবিত্র। তাঁদের সবার মাধ্যমে যে মৌল বাণী দুনিয়ার সামনে পেশ করা হয়েছে, তা দুনিয়ার মানুষের জন্যে একান্তই বিশ্বাস্য ও নির্ভরযোগ্য। এই ধরনের বিশ্বাস্য ও নির্ভরযোগ্য কথা-ই প্রকৃত জ্ঞান-লাভের চূড়ান্ত ও অপ্রতিবাদ্য উৎস ও মাধ্যম।

৭. সব কয়টি শর্তের মধ্যে সর্বশেষ শর্ত হল পরকালের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়—ইয়াকীন। এ শর্তটির সর্বশেষে উল্লেখ হলেও এটির গুরুত্ব সর্বাধিক। কুরআন মজীদ যাঁরা উপস্থিত মন নিয়ে চিন্তা-বিবেচনা-গবেষণা সহকারে পাঠ করেন, তাঁদের মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, 'গায়বের' প্রতি ঈমানকে যখন প্রথম শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, তখন পরকালীন জীবনের কথা ভিন্ন ভাবে বলার কি প্রয়োজন থাকতে পারে, ওটা-ও তো গায়বের পর্যায়ভুক্ত জিনিস। এটিকে একটি আলাদা শর্ত হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখের কি কারণ থাকতে পারে?

এর জবাবে বলা যায়, পরকালীন জীবনও গায়বের অন্তর্ভুক্ত, তাতে সন্দেহ নেই। কেননা সেটিও মানুষের বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের আওতায় পড়ে না। কিন্তু কেবল পরকালীন জীবন-ই নয়, ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য প্রত্যেকটি ব্যাপারই গায়বভুক্ত। এ ধরনের কোন একটি ব্যাপারও মানুষের প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে আসতে পারে না। মানুষের পঞ্চন্দ্রিয়ের কোন একটি দিক দিয়েও তা

অনুভূত হয় না। ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ব্যাপার বা ঘটনা যতক্ষণ বাস্তবে সংঘটিত না হচ্ছে, ততক্ষণই তা গায়বভুক্ত। তা যখন সংঘটিত হবে, তখন আর তা 'গায়ব' থাকবে না, তখন তা ভবিষ্যতের ব্যাপারও নয়। তখন তা বর্তমানও নয়, অতীত ব্যাপার। ছোট ছোট ব্যাপারের কথা না বললেও চলে, বিশ্ব-ইতিহাসের বিপ্লবাত্মক বা যুগান্তকারী ঘটনাবলী (epoch making events) সম্পর্কে চিন্তা করলেও জানা যায়-এ ঘটনাবলীর বাস্তবে সংঘটিত হওয়ার পূর্বে সে সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছু বলারই উপায় ছিল না। তার কিছু কিছু লক্ষণ দেখে চিন্তাশীল লোকেরা কিছুটা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারত বটে; কিন্তু তা নিতান্তই আন্দাজ-অনুমান ছাড়া আর কিছুই হতো না। অনেক সময় তা ভিত্তিহীন মিথ্যাও প্রমাণ হয়ে যেত। সে ঘটনাগুলো প্রপঞ্চ পর্যায়ের, প্রকৃতির বাহ্য মূর্তি সংক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও—প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশমূলক নিয়ম-নীতির অধীনই তা হতো এবং পদার্থ ও রাসায়নিক হওয়ার দরুন বিজ্ঞানের আয়ত্তাধীন হওয়া সত্ত্বেও বৈষয়িক জীবনের—এসব যুগান্তকারী ঘটনা সম্পর্কে আগে-ভাগে কিছুই অনুমান করা সম্ভব হয়নি, তাহলে সর্বাধিক যুগান্তকারী সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবাত্মক—সর্বশেষ ঘটনাটি—যার পরে আর কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার নেই, যা পদার্থ সংক্রান্ত ও রাসায়নিক নিয়ম-বিধান-বহির্ভুত—প্রকৃতি-বহির্ভূত নিয়মাধির অধীন সংঘটিত হবে, মানুষের বিবেক-বুদ্ধি সে বিষয়ে কি বলতে পারে, আর আন্দাজ বা অনুমানই বা কি করতে পারে? অথচ পরকালীন জীবন এমনই একটা ব্যাপার, যে সম্পর্কে পূর্ব থেকেই সব মানুষের পূর্ণমাত্রায় অবহিত হওয়া আবশ্যক। যেন মানুষ এই জীবনেই সেজন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে, যেন তার এ জীবনের যাবতীয় কাজ-কর্ম নিয়ন্ত্রিত হতে পারে পরকাল বিশ্বাসের ভিত্তিতে; যেন পরকাল সংঘটিত হওয়ার পর কেউ বলতে না পারে, আমি তো এর কিছুই জানতাম না, আমি তো আজকের দিনের জন্যে কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারিনি। পূর্বে জানা থাকলে এজন্যে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা চলত, এ প্রস্তুতি তো মানুষের ইখতিয়ারভুক্ত ছিল পুরা মাত্রায়!

এই কারণে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ও অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে পরকালীন জীবন সম্পর্কে আগাম সংবাদ জানিয়েছেন এবং সে বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় ও সংশয়হীন বিশ্বাস গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। এ পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলার মোটামুটি বক্তব্য হচ্ছে ঃ

ক. একটা সময় বর্তমান বস্তুজগতের সামগ্রিক ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

খ. এ জগতের চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর আর একটা নবতর বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

গ. প্রথম দিন থেকে বর্তমান ব্যবস্থা চূর্ণ হওয়া পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়ায় এসেছে, এক নিমিষে তারা সকলে পুনরুজ্জীবিত হবে।

ঘ. সমস্ত মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করে একটি স্থানে একত্রিত করা হবে এবং এই দুনিয়ার জীবনে তাদের করা সমস্ত আমলের হিসেব-নিকেশ তখন গ্রহণ করা হবে। আর প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল দান করা হবে।

এই সমস্ত ঘটনার সম্মিলনে যে বিরাট মহা ঘটনা সংঘটিত হবে, আল্লাহ তা'আলা তাকেই বলেছেন 'আখিরাত' বা 'পরকাল'। পরকাল হবে—এই দৃঢ় প্রত্যয় ও ইয়াকীন আল্লাহ্র কিতাব থেকে হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়ার জন্যে সর্বশেষ জরুরী শর্ত। পরকাল সংঘটিত হওয়ার আগাম খবরটি আবহমানকাল থেকে প্রত্যেক নবী ও রাসূলের দেয়া 'মুতাওয়াতির' সংবাদ। লক্ষণ ও নিদর্শনাদি দেখে নিতান্ত ধারণা-অনুমানের ভিত্তিতে দেয়া সংবাদ নয়। ফলে তার সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কারোর একবিন্দু সন্দেহ হওয়ার কোনই কারণ বা তার অবকাশ নেই। এ সংবাদ অত্যন্ত বিশ্বস্ত—নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া। প্রত্যেক যুগের জাতির জনগণের নিকট আল্লাহ্র প্রেরিত নির্বাচিত মহান ব্যক্তিগণ এই সংবাদ দিয়েছেন এবং এই সত্য সম্পর্কে সকল মানুষকেই সতর্ক করে দিয়েছেন।

যে সব লোক অনাগত পরিবর্তনসমূহ সম্পর্কে অসতর্ক ও অসাবধান থেকে বর্তমানের সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও আরাম-আয়েশে নিমগ্ন হয়ে সময়, শক্তি ও জীবন সামগ্রীর অপব্যয় ও অপচয় করে বেড়ায়, যখন সে পরিবর্তনটি এসে যায়, তখন তারা ভীষণ অসুবিধায় পড়ে যায়। তখন তারা অনুশোচনার আগুনে জ্বলতে বাধ্য হয়। তখন তারা শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অধস্তন বংশধরদের সে বিষয়ে সতর্কও করে দেয়। আর স্বাভাবিকও এটা। কিন্তু আসল, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ পরিবর্তন সমীপবর্তী, যে বিষয়ে কারো কোন অভিজ্ঞতা নেই। তা সত্ত্বেও বৈষয়িক পরিবর্তন আবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে সে দিকে ইঙ্গিত করা চলে অতি সহজেই।

পরকালীন জীবনের আগাম সংবাদ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে কৌতুহল ঔৎসুক্য ও ভয়-ডরের ভাবধারাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। পরকালে মানুষকে জান্নাত বা জাহান্নামের জীবন দান করা হবে। জান্নাতে মানুষের সুখ ও সম্ভোগের এমন স্থায়ী ও অফুরন্ত ব্যবস্থা থাকবে, যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। আর

জাহান্নামের জীবন সীমা-শেষহীন দুঃখ-কষ্ট দুর্ভোগ নির্যাতন নিষ্পেষণের ভয়াবহতায় পরিপূর্ণ। মানুষ তা কল্পনা করলে রোমাঞ্চিত হতে বাধ্য হয়। এমতাবস্থায় পরকালীন জীবন জান্নাতী জীবন হতে পারে কেবল মাত্র তখন, যদি মানুষ তার পূর্ণ বৈষয়িক জীবন আল্লাহ্‌র বিধান মুতাবিক যাপন করে। অন্যথায় পরকালীন জীবন জাহান্নামী জীবন হওয়া থেকে কেউ রোধ করতে পারবে না।

পরকালের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিলে মানব মনে দোযখী জীবনের ভয় ও আতংক এবং জান্নাতী জীবনের জন্য আগ্রহ ও ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পাওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। বস্তুত অন্যায়-অনাচার থেকে মানুষকে দূরে রাখার এবং ন্যায় ও কল্যাণময় কাজে মানুষকে যত্নবান বানাবার জন্যে এই ভয় ও আগ্রহের তুলনায় অধিক বলিষ্ঠ ও স্থায়ী উদ্বোধন মানবিক জগতে আর কিছুই হতে পারে না। মানুষ যে কাজে সুখ-শান্তি ও মুনাফা দেখে সে কাজ সে খুবই আগ্রহ সহকারে সম্পন্ন করে এবং যে কাজে ক্ষতি ও বিপদের আশংকা, সে কাজ থেকে মানুষ স্বতঃই বিরত থাকে। মানব প্রকৃতি নিহিত ভাবধারার দৃষ্টিতে এ অতীব সত্য কথা। চিরন্তন জান্নাতী জীবন লাভের তুলনায় অধিক লোভনীয় ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। দোযখী জীবনের চেয়ে চরম মর্মান্তিক অবস্থা মানুষের আর কিছুই হতে পারে না।

এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে নিম্নোদ্ধৃত কথা কয়টি অনস্বীকার্য সত্য হয়ে দেখা দেয়। প্রথম কথা ঃ মানুষের মনস্তত্ত্বে এ কয়টি ভাবধারা নিহিত ঃ

ক. অনুসন্ধান আবেগ ও প্রবণতা;

খ. বন্দেগী কবুলের আবেগ ও প্রবণতা;

গ. সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও ভালবাসামূলক ভাবাধারা;

ঘ. ভয় ও আতঙ্ক বোধ; এবং

ঙ. আগ্রহ ও ঔৎসুক্য।

দ্বিতীয়—মানুষ তার হৃদয় নিহত এ ভাবধারার চরিতার্থতার উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় সদা কর্মতৎপর হয়ে থাকে।

তৃতীয়—এ ভাবধারাসমূহের চরিতার্থতা যত মাত্রার হবে, বাস্তবে কাজও হবে ঠিক তত মাত্রায়।

চতুর্থ—হৃদয়াবেগের চরিতার্থতা অর্জনের দুটি মাত্র উপায় রয়েছে। তার একটি হল বস্তুগত উপায় আর দ্বিতীয়টি বস্তু ও প্রকৃতি অতীত। বস্তুগত ও

বৈষয়িক উপায়-উপকরণে মানবীয় ভাবধারার চরিতার্থতা অর্জিত হলে মানবীয় ব্যক্তিত্বের বিকাশ অনেক মাত্রায় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাতে যা হবে তাকে বিকাশ না বলে উল্টো দিকে সংকোচন বলা অধিক যুক্তিযুক্ত। মানবীয় ব্যক্তিত্বের বিকাশ বলতে কি বোঝায়? স্বভাব-প্রকৃতি, বিবেক-বুদ্ধি-নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা—মানুষের এ চারটি দিকেরই সুসম বিকাশ ও উৎকর্ষ লাভই হচ্ছে মানবীয় ব্যক্তিত্বের বিকাশের সত্যিকার তাৎপর্য। পেছনের পৃষ্ঠাগুলোতে এরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

সঠিক নির্ভুল সুষ্ঠু পথে মানব-ব্যক্তিত্বের বিকাশ হতে পারে তখন, যখন তার হৃদয় নিহিত ভাবধারাসমূহের পরিপূর্ণ চরিতার্থতা সাধিত হবে প্রকৃত ও প্রত্যয়পূর্ণ উপায়ে। কিন্তু বিজ্ঞান এই প্রকৃত ও প্রত্যয়পূর্ণ—ইয়াকিনী—উপায়ের সন্ধান করতে পারে না। কথার সত্যতা বুঝবার জন্যে দেখুন, বর্তমান বস্তুগত উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভের উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েও মানুষ সে প্রকৃত উপায় ও পন্থা আয়ত্ত করতে পারেনি, যা মানব-ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের জন্যে অপরিহার্য।

৮. বিশ্বলোক-স্রষ্টা স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, সঠিক নির্ভুল পথ—মানব-ব্যক্তিত্ব বিকাশের সঠিক পন্থা—কেবল তারাই অবলম্বন করতে পারে, যারা এ শর্ত কয়টি পুরা মাত্রায় পূরণ করবে। আর দুনিয়া আখিরাতের চরম ও পরম কল্যাণ লাভে সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে কেবল সেই লোকেরাই।

গ্রন্থকার পরিচিতি

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) বর্তমান শতকের এক অনন্যসাধারণ ইসলামী প্রতিভা। এ শতকে যে ক'জন খ্যাতনামা মনীষী ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েমের জিহাদে নেতৃত্ব দানের পাশাপাশি লেখনীর সাহায্যে ইসলামকে একটি কালজয়ী জীবন দর্শন রূপে তুলে ধরতে পেরেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম।

এই ক্ষণজন্মা পুরুষ বাংলা ১৩২৫ সনের ৬ মাঘ, ইংরেজী ১৯১৮ সালের ১৯ জানুয়ারী সোমবার বর্তমান পিরোজপুর জিলার কাউখালী থানার অন্তর্গত শিয়ালকাঠি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি শর্ষীনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম এবং ১৯৪০ ও ১৯৪২ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে যথাক্রমে ফাযিল ও কামিল ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণায় নিরত থাকেন। ১৯৪৬ সালে তিনি এ ভূখণ্ডে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেন এবং সুদীর্ঘ চার দশক ধরে নিরলসভাবে এর নেতৃত্ব দেন।

বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) শুধু পথিকৃতই ছিলেন না, ইসলামী জীবন-দর্শনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ৬০টিরও বেশি অতুলনীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'কালেমা তাইয়েবা', 'ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা', 'মহাসত্যের সন্ধানে', 'বিজ্ঞান ও জীবন বিধান', 'বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব', 'আজকের চিন্তাধারা', 'পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি', 'সুন্নাত ও বিদয়াত', 'ইসলামের অর্থনীতি', 'ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন', 'সুদমুক্ত অর্থনীতি', 'ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা', 'নারী', 'পরিবার ও পারিবারিক জীবন', 'আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ', 'আল-কুরআনের আলোকে শিরক ও তওহীদ', 'আল-কুরআনের আলোকে নবুয়্যাত ও রিসালাত', 'আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার', 'ইসলাম ও মানবাধিকার', 'ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা', 'রাসূলুল্লাহ্র বিপ্লবী দাওয়াত', 'ইসলামী শরীয়াতের উৎস', 'অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম', 'অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ইসলাম', 'শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি', 'ইসলামে জিহাদ', 'হাদীস শরীফ (৩ খণ্ড)' ইত্যাকার গ্রন্থ দেশের সুধীমহলে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছে। এছাড়া অপ্রকাশিত রয়েছে তাঁর অনেক মূল্যবান পাণ্ডুলিপি।

মৌলিক ও গবেষণামূলক রচনার পাশাপাশি বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী মনীষীদের রচনাবলি বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারেও তাঁর কোনো জুড়ি নেই। এসব অনুবাদের মধ্যে রয়েছে মওলানা মওদূদী (রহ)-এর বিখ্যাত তফসীর 'তাফহীমুল কুরআন', আল্লামা ইউসূফ আল-কারযাভী-কৃত 'ইসলামের যাকাত বিধান' (দুই খণ্ড) ও 'ইসলামে হালাল-হারামের বিধান', মুহাম্মদ কুতুবের 'বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত', এবং ইমাম আবু বকর আল-জাস্সাসের ঐতিহাসিক তফসীর 'আহ্কামুল কুরআন'। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যাও ৬০টির উর্ধ্বে।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-র অন্তর্গত ফিকাহ্ একাডেমীর একমাত্র সদস্য ছিলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সূচিত 'আল-কুরআনে অর্থনীতি' এবং 'ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস' শীর্ষক দুটি গবেষণা প্রকল্পেরও সদস্য ছিলেন। প্রথমোক্ত প্রকল্পের অধীনে প্রকাশিত দুটি গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ তাঁরই রচিত। শেষোক্ত প্রকল্পের অধীনে তাঁর রচিত 'সৃষ্টিতত্ত্ব ও ইতিহাস দর্শন' নামক গ্রন্থটি এখন প্রকাশের অপেক্ষায়।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) ১৯৭৭ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন ও রাবেতা আলমে ইসলামীর সম্মেলন, ১৯৭৮ সালে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইসলামী দাওয়াত সম্মেলন, একই বছর করাচীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ইসলামী মহাসম্মেলন, ১৯৮০ সনে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত আন্তঃপার্লামেন্টারী সম্মেলন এবং ১৯৮২ সনে তেহরানে অনুষ্ঠিত ইসলামী বিপ্লবের তৃতীয় বার্ষিকী উৎসবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

এই যুগ স্রষ্টা মনীষী বাংলা ১৩৯৪ সনের ১৪ আশ্বিন (ইংরেজী ১৯৮৭ সালের ১ অক্টোবর) বৃহস্পতিবার এই নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। 'ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিঊন।'


খায়রুন প্রকাশনী